শ্রীকান্ত

(নাটক)

১ম ও ২য় পর্ব্ব অবলম্বনে

নাট্যরূপ

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট : কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ় ১৩৬৪

মূল্য : দুই টাকা

চরিত্র

পুরুষ

কান্ত (বড়)
(ছোট)
দ্রনাথ
াহজী
দা
কবাবু
াচার্য্য

তা
র্জন
টুলাল
কৃষ্ণবাবু
তন
বাবা

জমিদার রামচন্দ্র সিং
নন্দ মিস্ত্রী
রোহিণী
সেজদা
যতীনদা
কিশোরী সিং
ছিনাথ বহুরূপী
কুমার বাহাদুর
ডাক্তার
হরিপদ মিস্ত্রী
উ-বা
অভয়ার স্বামী
গোবিন্দ ডাক্তার
প্রসন্ন ঠাকুরদা
অন্যান্য

স্ত্রী

দিদি
লক্ষ্মী (পিয়ারী বাইজী)

টগর
জনৈকা বাইজী
দ্বারিকবাবুর স্ত্রী

বর্ম্মী নর্ত্তকী, প্রভৃতি।

সকলকে ছাপাইয়া গিয়াছে। ইহারই মাঝে দূর হইতে বাঁশীর আওয়াজ ভাসিয়া আসিতে থাকে, ছেলেরা উৎকীর্ণ হইয়া তাহা শোনে। ইতিমধ্যে পিসিমা ঘরে প্রবেশ করিয়া মেজদা অর্থাৎ সতীশকে জিজ্ঞাসা করেন

পিসি। হ্যাঁ রে সতীশ! অমন কোরে কে বাঁশী বাজাচ্ছে রে?

সতীশ। কে আবার, রায়দের ইন্দ্র।

পিসি। বলিস্ কি রে? ওর কি পড়াশুনা নেই?

সতীশ। পড়াশুনা ও অনেক কাল শেষ কোরে দিয়েছে। ও হেড-পণ্ডিতের টিকি কাঁচি দিয়ে ক্লাসের ভেতর কেটে দিয়েছিল, হেড্‌মাষ্টার তাই ওকে গাধার টুপি পরিয়ে দেবেন বলেছিলেন বলে সেইরাগে ও হেড্‌মাষ্টারের পিঠে এক ঘুসি মেরে স্কুল ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে—আর যায় না।

পিসি। বলিস্ কি রে! ধন্যি ছেলে না হোক।

সতীশ। এখন ওর কাজ হয়েছে—বাঁশী বাজান আর নদীতে নৌকো বাওয়া।

পিসি। মনে হচ্ছে যেন গোঁসাই বাগানের ভেতর দিয়ে বাঁশী বাজিয়ে এইদিকেই আসছে। তা ওর মা কি বারণ করে না! গোঁসাই বাগানের মধ্যে যে কত লোক সাপের কামড়ে মোলো তার আর ঠিক নেই।

সতীশ। তাতে ওর কি মা! যার প্রাণের মায়া নেই—ভয় নেই—সে কেন শুধু শুধু বড় রাস্তা দিয়ে ঘুরে আসতে যাবে? ওর শিগ্‌গীর আসা নিয়ে দরকার। তা সে পথে নদী-নালাই থাক, আর সাপ-খোপ বাঘ-ভাল্লুকই থাক্।

পিসি। যা বলেছিস্।

[প্রস্থান

শ্রীকান্ত। যাই বল মেজদা! ইন্দ্রর কিন্তু খুব সাহস, সেদিন ও না থাকলে স্কুলের মাঠে বিপক্ষদল আমায় ছাতাপেটা করে মেরে ফেলেছিল আর কি!

সতীশ। নে নে, বীরত্বের বড়াই করে আর কাজ নেই—যা করছিস্ তাই কর।

পুনরায় সকলে পড়া আরম্ভ করিল। মেজদা পুনরায় Let A B C be a triangle আরম্ভ করিলেন। ইহার মাঝে যতীনদা একটা টিকিট লইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়।

যতীন। মেজদা!

সতীশ। (পড়া থামাইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া) কি?

যতীন। একটা টিকিট।

সতীশ। কিসের?

যতীন। নাকা ঝাড়া।

সতীশ। (ঘড়ির দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে যতীনকে বলিলেন ' হুঁ'। —৮-৩৩ মিঃ থেকে ৮-৩৪½ মিনিট পর্য্যন্ত; মনে থাকে।

যতীন। আচ্ছা।

[প্রস্থান

যতীন চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেজদা পুনরায় জ্যামিতি পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। ইতিমধ্যে ছোটদা একটি টিকিট লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া—

ছোটদা। মেজদা একটা টিকিট।

সতীশ। (গম্ভীরভাবে) কিসের?

ছোটদা। থুথু ফেলা।

সতীশ। (ধমক দিয়া) না।

পুনরায় পড়া সুরু হইল। ইতিমধ্যে যতীনদা ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীকান্ত তেষ্টা পাওয়ার টিকিট দাখিল করিল—মেজদা গম্ভীরভাবে মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন

সতীশ। ও! তোরও অমনি তেষ্টা পেয়ে গেল!

শ্রীকান্ত। সত্যি বলছি মেজদা, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

সতীশ। দাঁড়া, দেখি কালকের খাতাটা, এ ক-দিনে তুই কিরকম জল খাচ্ছিস দেখে, তবে ছুটি দেবো।

সতীশ অর্থাৎ মেজদা খাতা উল্টাইতেছেন, ছোটদা ও যতীনদা পড়িতেছেন শ্রীকান্ত তাহারই সম্মুখে অপরাধীর ন্যায় দাঁড়াইয়া। ইতিমধ্যে সহসা অবিকল একটি বাঘের আকারের জীব "হুম্" শব্দে শ্রীকান্তের পশ্চাতে আসিয়া লাফাইয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া সকলেই তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল

"ও রে বাবা রে! খেয়ে ফেললে রে! মলাম রে! গেলাম রে!"

মেজদা গোঁ-গোঁ শব্দে প্রদীপ পিলসুজ উল্টাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। যে জীবটি প্রবেশ করিয়াছিল; সে সকলের অবস্থা দেখিয়া ভয়ে একলাফে ডালিমগাছের ঝোপের ভেতর আত্মগোপন করিল। ইতিমধ্যে পিসেমশাই ছুটিয়া আসিয়া দুই ছেলেকে দুই বগলে চাপিয়া ধরিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতে সুরু করিয়াছেন

পিসেমশাই। এই দারোয়ান! এই কিশোরী সিং! মার্ ডালো শালাকো আউর মারো—

মেজদার গোঙানি তখনও বন্ধ হয় নাই। রামকমল ভট্টাচার্য্যের তখন আফিমের নেশা ছুটিয়া গিয়াছে। তিনি ভয়ে দিশেহারা হইয়া সদর ফটক দিয়া বাড়ী পালাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন— এদিকে দারোয়ান কিশোরী সিং চোর ভ্রমে ভট্টাচার্য্য মশাইকে

ঠাঙ্গাইতে আরম্ভ করিয়াছে—আর ভট্টাচার্য্য মশাই প্রাণপণে চীৎকার আরম্ভ করিয়াছেন—

রামকমল। ওরে বাবা! আমি চোর নই! আমাকে ছেড়ে দে রে বাবা!

একদিকে ভট্টাচার্য্য মশাইয়ের আকুল মিনতি ও অন্যদিকে পিসে-মশায়ের "আউর মারো শালাকো—মার ডালো" চীৎকারে সারা বাড়ী তথা সমগ্র পাড়াময় সোরগোল সুরু হইয়াছে। বাড়ীর মেয়েরাও ইতিমধ্যে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়াছেন। দারোয়ান কিশোরী সিং ও অপর দুইজন—হিন্দুস্থানী চাকর বাহির হইতে মারিতে মারিতে চোরকে টানিয়া আনিয়া এতক্ষণে আলোর সম্মুখে ফেলিয়াছে। চোর আর কেহ নয়—রামকমল ভট্টাচার্য্য। ভট্টাচার্য্য মশাইকে দেখিয়া পিসেমশাই সম্বিত ফিরিয়া পাইলেন এবং বলিলেন

পিসেমশাই। আরে তোরা করেছিস্ কি? ছাড়্ ছাড়্ এ যে ভট্টাচার্য্য মশাই!

দারোয়ান চাকরেরা ভট্টাচার্য্য মশাইকে ছাড়িয়া দিল। তিনি তখন বেদম প্রহারে কাতর। তখন ভট্টাচার্য্য মশাইকে কেহ চোখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগিল কেহ বা মাথায় পাখার বাতাস করিতে লাগিল।

কিশোরী সিং। মাফ্ কী জিয়ে হুজুর, বহুৎ কসুর হো গিয়া।

রামকমল। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) আর কসুর! কীলায়কে কীলায়কে একেবারে কাঁঠাল পাকায় দিয়া—গা গতর একেবারে চূর্ণ-বিচুর্ণ হো গিয়া বাবা!

পিসেমশাই। যত ব্যাটা উজবুক! চোর কোথা দিয়ে পালাল তার ঠিক নেই, আর নিরীহ ভট্টাচার্য্য মশাইকে ধরে শুধু শুধু ঠাঙ্গাল।

রামকমল। না—না চোর নয়, চোর নয়, আমি নিজে চোখে দেখেছি—মস্ত বড় একটা ভাল্লুক!

পিসেমশাই। এঁ্যা! ভাল্লুক! বলেন কী?

যতীন। না বাবা ভাল্লুক নয়—একটা বাঘ হুম্ করে লাফিয়ে পড়ল! এতক্ষণে সতীশের চৈতন্য ফিরিয়া আসিয়াছে সে ঢুলু ঢুলু নেত্রে জড়িত কণ্ঠে বলিল—

সতীশ। The Royal Bengal Tiger!

পিসিমা। তা বাঘই হোক, আর ভাল্লুকই হোক, সেটা গেল কোথায়? ওই হোঁত্‌কা হোঁত্‌কা দারোয়ান চাকরগুলো আছে কীসের জন্যে? ওদের খুঁজে বার করতে বলো। ছেলেপিলেগুলো ভয়ে সারা হ'য়ে গেল! নিরীহ বেচারীকে ধরে ঠেঙ্গালে! আর আসল কাজের বেলায় ওরা কেউ নয়। দু'বেলা বসে বসে ডাল রুটি খাচ্ছে আর শরীরের তাথ্‌ত করছে।

কিশোরী সিং তাহার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল

কিশোরী সিং। মিলা মাইজী—মিলা, উহা বয়ঠা, একঠো বড়িয়া শের্।

পিসেমশাই। এঁ্যা! শের্! বাঘ!

দেখা গেল বাঘের নাম শুনিয়া সকলেই ভয়ে কাঁপিতেছে। বারান্দা খালি হইয়া গিয়াছে। সকলেই ভয়ে জড় সড় হইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। পিসেমশাই কম্পিত কণ্ঠে হুকুম চালাইতে লাগিলেন

পিসেমশাই। সড়কি লাও, বন্দুক লাও—

পিসেমশাইয়ের গগনভেদী চীৎকারের মাঝে জনৈক তরুণ ব্যস্তভাবে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল—ইহারই নাম ইন্দ্রনাথ।

ইন্দ্র। কি কি ব্যাপার কী? কী হ'ল?

পিসিমা। ওরে বাঘ—বাঘ! ইন্দ্র পালিয়ে আয়।

ইন্দ্রনাথ ছুটিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া কহিল

ইন্দ্র। বাঘ! এখানে বাঘ এলো কি করে?

পিসেমশাই। কি জানি বাবা?

সতীশ জড়িতকণ্ঠে কহিল—

সতীশ। The Royal Bengal Tiger.

কিশোরী সিং। (ডালিম গাছের প্রতি হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিল) জী উহা বয়ঠা।

ইন্দ্রনাথ ডালিম গাছের দিকে কিছুক্ষণ দৃষ্টিপাত করিয়া পরে হ্যারিকেনটা হাতে লইয়া বলিল—

ইন্দ্র। দেখি তো কি রকম বাঘ।

পিসিমা। ওরে যাসনে ইন্দ্র! যাসনে। কী ডাকাত ছেলে রে বাবা! বাঘকে ভয় করে না!

ইন্দ্র। আমরা এতোগুলো লোক রয়েছি—বলি, বাঘেরও তো প্রাণের ভয় আছে, দেখি না ব্যাপারটা কি?

ইন্দ্রনাথ লণ্ঠন লইয়া ডালিম গাছের নিকট গিয়া বাঘটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল।

ইন্দ্র। কিন্তু এতো বাঘ বলে বোধ হচ্ছে না।

ইন্দ্রনাথের কথায় বাঘ অর্থাৎ শ্রীনাথ বহুরূপী দুই থাবা জোড়া করিয়া কহিল—

শ্রীনাথ। না বাবু মশাই—আমি বাঘও নই, ভাল্লুকও নই, আমি ছিনাথ বউরূপী।

শ্রীনাথের কথায় ইন্দ্রনাথ হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল।

ইন্দ্র। বহুত আচ্ছা! আচ্ছা সাজ সেজেছ বটে!

ইতিমধ্যে সকলে আশ্বস্ত হইয়া ঘর হইতে উঠানে লাফাইয়া

পড়িলেন। ভট্‌চার্য্যিমশাই খড়ম হাতে লইয়া শ্রীনাথের দিকে আগাইয়া গেলেন।

রামকমল। হারামজাদা! তুমি ভয় দেখাবার আ জায়গা পাওনি?

পিসেমশাই। শালাকো কান পাকড়কে লাও।

ছিনাথ বহুরূপীর দেহে বাঘের বেশ থাকিলেও মুখ হইতে বাঘের মুখোসটি এতক্ষণে সে খুলিয়া ফেলিয়াছে। কিশোরী সিং পিসে-মশাইয়ের হুকুমে কান ধরিতে উদ্যত হইলে ইন্দ্রনাথ বাধা দিয়া বলিল—

ইন্দ্রনাথ। আঃ! কেন আর বেচারীকে—

রামকমল। বল কী হে ছোকরা! এই বজ্জাত হারামজাদা ব্যাটাকোয়াস্তে হামারা গা-গতর চূর্ণ-বিচূর্ণ হো গিয়া। (দারোয়ান-চাকরদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন) আর এই শালার ব্যাটারা আমাকে কীলায়কে কীলায়কে একদম কাঁঠাল পাকায়া দিয়া।

শ্রীনাথ। (ভট্টাচার্য্য-মশাইয়ের পায়ে পড়িয়া) মাফ করুন ঠাকুর মশাই! আমি বুঝতে পারিনি যে ছেলেরা আর আপনারা এমন ক'রে ভয় পাবেন। কালও তো এ বাড়ীতে নারদ সেজে গান গেয়ে গেছি। তাই ভাবলাম আমার এ সাজ দেখেই আপনারা চিনে নেবেন।

পিসেমশাই। কি ক'রে চিনে নেবে? চেনবার কি আর কোন উপায় রেখেছিস্?

পিসিমা। সে উপায় ও যদি নাই রেখে থাকে, তাহলে ওর ওপর রাগ-ঝাল না দেখিয়ে এখন বক্‌শিস্ দিয়ে ওকে বিদেয় কর।

ইন্দ্রনাথ। ঠিক বলেছেন! (সহসা শ্রীকান্তকে দেখিয়া চাপা-গলায় বলিল) কি রে! শ্রীকান্ত তুই বুঝি এই বাড়ীতে থাকিস?

শ্রীকান্ত ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—'হ্যাঁ।'

পিসেমশাই। না না ওকে কিছুতেই ছাড়া হবে না। ওর জন্তে ভট্টচার্য্যি মশাইয়ের লাঞ্ছনার আজ আর শেষ নেই।

পিসেমশাই ও পিসিমার এই কথার মাঝে দেখা যায় ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তর মধ্যে সকলের অলক্ষ্যে ইঙ্গিতে কি যেন কথাবার্ত্তা হইয়া গেল এবং পিসেমশাই ও পিসিমার তর্কের মাঝে উহারা সরিয়া পড়িল।

পিসিমা। লাঞ্ছনার জন্য দায়ী ও নয়, দায়ী তোমার দেউড়ীর দারোয়ানরা। ও বেচারীকে ছেড়ে দাও। আর দূর করে দাও—তোমার ঐ পালোয়ান নামধারী দারোয়ানগুলোকে। একটা ছোট ছেলের যা সাহস আর এতগুলো লোকের তা নেই।

পিসেমশাই। ছেড়ে দেবো? ও আজ যা করেছে, ওর ল্যাজটা কেটে নিয়ে তবে ওকে ছেড়ে দেবো।

পিসিমা। (বিরক্তভাবে) হ্যাঁ তাই নাও—তোমার ওটা অনেক কাজে লাগবে।

[প্রস্থান]

পিসেমশাই। কিশোরী সিং! উস্‌কো ল্যাজ কাট্‌ লেও।

শ্রীনাথ। দোহাই বাবুমশাই! অনেক পয়সা খরচ ক'রে এই সাজটা করেছি। ল্যাজটা কেটে নিলে বড়ই ক্ষতি হবে।

পিসেমশাই। তবে আর এ রকম যা-তা সেজে কোনদিন আমার বাড়ীতে ঢুকবি না—

শ্রীনাথ। না।

পিসেমশাই। যা দুর হ!

দ্বিতীয় দৃশ্য

নদী

বর্ষাকাল। গভীর জলধারায় নদীর দুকূল ছাপিয়া গিয়াছে। নিবিড় অন্ধকার রাত্রে নদীর জলধারা জোনাকীর ক্ষীণালোকে চিক্‌মিক্ করিতেছে। একটানা উন্মত্ত জলস্রোত বহিয়া চলিয়াছে, মধ্যে মধ্যে জলের স্রোতের উপর বালির পাড় ভাঙ্গার শব্দ শোনা যাইতেছে। নদীর বুকে এখন জলের কলরোল ও কেবলমাত্র পাড় ভাঙ্গার আওয়াজ নিশিথিনীর নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করিতেছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার আওয়াজ ও দূরে শেয়ালের চীৎকার শোনা যাইতেছে। এই অশান্ত নদীর বুকে ছোট্টএকটি জেলে ডিঙিতে করিয়া ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তকে ভাসিয়া আসিতে দেখা গেল।

ইন্দ্রনাথ। কি রে শ্রীকান্ত! তোর ভয় করছে না তো?

শ্রীকান্ত। না।

ইন্দ্রনাথ। এই তো চাই। সাঁতার জানলে আবার ভয় কিসের?

(সহসা পাড় ভাঙার শব্দ শোনা গেল)

শ্রীকান্ত। ও কিসের আওয়াজ ইন্দ্র?

ইন্দ্র। জলের স্রোতে ওপারের বালির পাড় ভেঙ্গে পড়ছে। ও তারই শব্দ।

শ্রীকান্ত। কি রকম স্রোত! অতবড় পাড় স্রোতের মুখে ভেঙ্গে পড়ছে!

ইন্দ্রনাথ। পড়বে না? এ নদীর স্রোতের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা কি সোজা কথা, দাঁড়া এইখানটায় নৌকো বাঁধি।

শ্রীকান্ত। এখানে নৌকা বেঁধে কি হবে ইন্দ্র?

ইন্দ্র। দূর বোকা! এইখান থেকেই তো মাছ তুলবো, দেখছিস্ না মায়াজাল পাতা রয়েছে। যা কিছু বড় মাছ তো ওরই মধ্যে—তুই লগিটা শক্ত করে ধরে দাঁড়া, আমি জাল থেকে গোটা কতক মাছ টপাটপ্ তুলে নিই।

শ্রীকান্ত লগির সাহায্যে শক্ত করিয়া নৌকোখানি এক জায়গায় ধরিয়া রাখিল। ইন্দ্রনাথ জাল টানিয়া কয়েকটা রুই কাত্‌লা বেশ ক্ষিপ্রতার সহিত তুলিয়া লইল। ইতিমধ্যে চেরা বাঁশের ফটাফট্ আওয়াজ শোনা গেল ও তার সঙ্গে ক্যানেস্তারা পিটানর আওয়াজ হইতে লাগিল, শ্রীকান্ত ভয় পাইয়া বলিল—

শ্রীকান্ত। ও কিসের আওয়াজ ইন্দ্র? জেলেরা টের পেলে নাকি?

ইন্দ্র। না, না, ও কিছু নয়। ভুট্টা ক্ষেতে চাষীরা মাচার ওপরে বসে বুনো শুয়োর তাড়াচ্ছে।

শ্রীকান্ত। বুনো শুয়োর? কোথায়?

ইন্দ্র। এখান থেকে কি আর দেখতে পাচ্ছি যে বলব, আছে কোথাও এইখানে (সহসা দূরে কি যেন লক্ষ্য করিয়া বলিল) শ্রীকান্ত আর কথা নয় চুপ্।

শ্রীকান্ত। (ভীত জড়িত কণ্ঠে) কেন? কী হ'ল?

ইন্দ্র। শালারা টের পেয়েছে বোধ হয়!

(শ্রীকান্ত দূরে লক্ষ্য করিয়া সভয়ে বলিল)

শ্রীকান্ত। তাইতো কী হবে ভাই?

ইন্দ্র। কিচ্ছু ভয় নেই, চল্ ঐ দিকের ওই ভুট্টা ক্ষেতের ভেতরে লুকোই।

শ্রীকান্ত বসিয়া রহিল, ইন্দ্রনাথ জোর জোর লগি ঠেলিয়া ভুট্টা ক্ষেতের দিকে অদৃশ্য হইল। চেরা বাঁশ ও ক্যানেস্তারার আওয়াজ

যথারীতি ভাসিয়া আসিতে লাগিল। ইতিমধ্যে দুইজন জেলে ছুটিয়া আসিল এবং যেখানে জাল পাতা ছিল তাহাদের মধ্যে একজন সেখানে আসিয়া জাল তুলিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল

১ম জেলে। কই রে? কোথায় কি, জাল ত যেমন পাতা ছিল তেমনই রয়েছে।

২য় জেলে। আমি বললাম মাছ আছাড় দিচ্ছে— ও তারই শব্দ! নে, চ— [উভয়ের প্রস্থান

জেলের চলিয়া যাওয়ায় কিছুক্ষণ পরে ইন্দ্রনাথের নৌকো ফিরিয়া আসিল।

শ্রীকান্ত। তুমি যে ভুট্টাক্ষেতের জল কাদার মধ্যে নেমে নৌকোটাকে টেনে নিয়ে গেলে, তোমার ভয় কোরলো না?

ইন্দ্র। ভয় আবার কি?

শ্রীকান্ত। বারে! তুমি তো নিজেই বললে কত রকমের সাপ ভেসে এসে ঐ ভুট্টাগাছের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

ইন্দ্র। হ্যাঁ, তাতো আছেই।

শ্রীকান্ত। যদি কামড়ে দিত!

ইন্দ্র। ওরা নিজেরাই এখন ভয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ভুট্টাগাছের সঙ্গে জড়িয়ে বসে আছে, আর যদি কাম্‌ড়াতো তাহলেই বা কি কোরতাম, বড় জোর মরে যেতাম, মরতে তো সকলকে একদিন হবেই। দাঁড়া, এইখানে নৌকোটা বাঁধি। (ইন্দ্রনাথ নৌকা বাঁধিয়া বলিল) তুই নৌকোতে চুপচাপ বসে থাক শ্রীকান্ত। আমি একবার ঐখানে জেলেদের বাড়ীতে যাব, আর ফিরে আসব। তাহলে আমি চললাম। একা থাকতে তোর ভয় করবে না তো শ্রীকান্ত!

শ্রীকান্ত। না না, ভয় আবার কিসের? তুমি যাও না।

(ইন্দ্রনাথ দুই এক পদ অগ্রসর হইয়াই ফিরিয়া আসিয়া বলিল)

ইন্দ্র। দ্যাখ্ শ্রীকান্ত, যদি কেউ মাছ চাইতে আসে কিছুতেই যেন দিস্‌নে।

শ্রীকান্ত। আচ্ছা।

ইন্দ্র। (যাইতে যাইতে পুনরায় ফিরিয়া) যদি খুব পীড়াপীড়ি করে তাহ'লে বলবি মুখে তোর ছাই দেবো। ইচ্ছে হয় নিজে তুলে নিয়ে যা। ইন্দ্রনাথ চলিয়া গেল—দূরে কুকুরের আওয়াজ ভাসিয়া আসিতে লাগিল। একজন হিন্দুস্থানী লোকের সহিত অল্পক্ষণের মধ্যেই ইন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিয়া বলিল

ইন্দ্র। বেশী দূর আর যেতে হোল না শ্রীকান্ত, এইখানেই আমার জন্যে এ অপেক্ষা কোরছিলো। দে, মাছগুলো বার করে দে।

শ্রীকান্ত গুটি তিন-চার বড় বড় মাছ একে একে আগাইয়া দিল। হিন্দুস্থানী লোকটি তাহার গামছায় মাছগুলি বাঁধিয়া লইল। ইন্দ্রনাথ বলিল —

ইন্দ্র। বহুৎ বড়িয়া মছ্‌লি। বহুৎ জেয়াদা ভাও দেনে হোগা।

হিন্দুস্থানী। ও বাৎ ছোড় দিজিয়ে বাবুজী, আজ তো দো রূপেয়া কম্‌তি লেনে হোগা। ইধার বহুৎ বেমারী হোতা—কই আদমী মছলী খাতা নেই, লিজিয়ে—

দেখা গেল কয়েকটি চক্‌চকে রৌপ্যমুদ্রা ইন্দ্রনাথের হাতে দিয়া লোকটি মাছ লইয়া চলিয়া গেল। ইন্দ্রনাথ টাকাগুলি ট্যাঁকে গুঁজিতে লাগিল, ইন্দ্রনাথকে মাছ বিক্রয় করিয়া টাকা লইতে দেখিয়া শ্রীকান্ত ঘৃণায় মুখ ফিরাইল। ইন্দ্রনাথের চক্ষু তাহা এড়াইল না! ইন্দ্রনাথ হাসিয়া কহিল

ইন্দ্র। মাছ চুরি করে আবার তা বিক্রী কোরলাম, এ দেখে আমার ওপর তোমার ঘৃণা হওয়াই স্বাভাবিক শ্রীকান্ত।

শ্রীকান্ত। না, না, তোমাকে ঘৃণা কোরতে যাব কেন?

ইন্দ্র। চাঁদের আলোয় যতটুকু মুখ দেখা যায়, ততটুকুতেই দেখতে পেয়েছি শ্রীকান্ত তোমার মুখে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ফুটে উঠেছে।

শ্রীকান্ত। ঠিকই ধরেছ ইন্দ্র, জেলেদের জাল থেকে তুমি যখন মাছগুলো তুলে নিলে, তখন তোমার সাহস দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম।

ইন্দ্র। আর এখন তা টাকা নিয়ে বিক্রী কোরলাম দেখে, তোমার ঘেন্না হচ্ছে এইতো!

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ। আমার মনে হ'ল, একাজ তো জেলখানার কয়েদীরা করে, একাজ তোমার দ্বারা কেন?

ইন্দ্র। বিশে ডাকাতের গল্প শুনেছিস্ শ্রীকান্ত?

শ্রীকান্ত। শুনেছি, সে ডাকাতি করে গরীব দুঃখীর দুঃখ ঘোচাতো।

ইন্দ্র। আমার মাছ চুরি, আর বিক্রী, এ'দুটোর মধ্যে যদি তেমন কোন উদ্দেশ্য থাকে?

শ্রীকান্ত। তাহলে আমি তাকে খুব ভালবাসি।

ইন্দ্র। আমিও তোকে খুব ভালবাসি শ্রীকান্ত, আমার এমন বন্ধু আর একটিও নেই। এবার থেকে আমি যখনই আসবো তোকে ডেকে নিয়ে আসবো, কেমন?

শ্রীকান্ত। বেশতো।

ইন্দ্র। কাল আবার তোকে আমার দিদির বাড়ীতে নিয়ে যাব।

শ্রীকান্ত। দিদির বাড়ী? সে কোথায়?

ইন্দ্র। এই কাছেই। কাল আমাকে পাঁচটা টাকা দিতে পারিস শ্রীকান্ত?

শ্রীকান্ত। পারি।

ইন্দ্র। ধার নয় কিন্তু—একেবারে দিতে হবে।

শ্রীকান্ত। বেশ! একেবারেই দেব। কিন্তু টাকা নিয়ে কি হবে ইন্দ্র?

ইন্দ্র। আমার দিদিরা বড্ড গরীব কিনা, তাদের দিতে হবে।

শ্রীকান্ত। আচ্ছা ইন্দ্র, তুমি এখানে একলা আসতে পার?

ইন্দ্র। আমি তো প্রায়ই একলা আসি।

শ্রীকান্ত। ভয় করে না?

ইন্দ্র। না, রাম নাম করি যে! রাম নাম কি সোজা? যাক্—ত্থাখ শ্রীকান্ত, ঐ যে সামনে বনের মত দেখাচ্ছে—ওর ভেতর দিয়ে আমাদের এবার যেতে হবে, ঐখানে আমি একবার যাব আর আসব। তারপরেই বাড়ী চলে যাব।

শ্রীকান্ত। রাত আর বেশী নেই, এখান থেকেই আজ ফিরে গেলে হত না?

ইন্দ্র। না শ্রীকান্ত, ওখানে আজ আমাকে একটিবার যেতেই হবে। আমি তিন দিন ওদের ওখানে যেতে পারিনি। মাছ বিক্রীর এই টাকা কটি ওদের আজ না দিলেই নয়।

শ্রীকান্ত। মাছ বিক্রীর টাকা তুমি ওদের দিতে যাবে কেন ভাই?

ইন্দ্র। আমার সঙ্গে তুই ওখানে গেলেই বুঝতে পারবি আর চোখেও দেখতে পাবি, তাদের কি অবস্থা! কলেরায় গ্রামকে গ্রাম উজাড় হতে বসেছে! ওষুধ নেই, পথ্যি নেই, নে চল্।

উভয়ে নৌকায় উঠিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। দেখা গেল, ইন্দ্রনাথের নৌকাখানি এখন নিস্তব্ধ এক শ্মশানের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মধ্যে মধ্যে ক্ষুধার্ত্ত শৃগালের কলহ ও চীৎকার শোনা যাইতেছে। গাছের উপর শকুনির পাখা ঝাপ্টানোর আওয়াজ, সব কিছু মিলাইয়া একটা ভয়াবহ পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে। ইন্দ্রনাথ নৌকা বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল

ইন্দ্র। দাঁড়া, নৌকোটা এখানে বাঁধি।

শ্রীকান্ত। (নাকে কাপড় চাপা দিয়া বলিল) এখান থেকে পালিয়ে চল ইন্দ্র, দুর্গন্ধে আর টেঁকা যাচ্ছে না।

ইন্দ্র। ঐ যে বললুম, কলেরায় গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছে। দেখছিসনে ওখানে ঐ বাচ্চা ছেলের মরা দেহটা কী রকমভাবে পড়ে রয়েছে!

শ্রীকান্ত মৃতদেহটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া বলিল

শ্রীকান্ত। ইস্! তাইতো!

ইন্দ্র। তুই একটু সরে দাঁড়া শ্রীকান্ত, আমি এ বেচারীকে ডিঙিতে তুলে ঐ চড়ায় ঝাউবনের মধ্যে রেখে আসি। নইলে বেচারাকে শেয়ালে ছেঁড়াছিঁড়ি করে খাবে।

শ্রীকান্ত। কি জাতের মড়া তার ঠিক নেই—ওকে তুমি ছোঁবে?

ইন্দ্র। মড়ার আবার জাত কি? এই যে আমাদের ডিঙিটা, এর কি কোন জাত আছে, আমগাছ, জামগাছ যে গাছেরই কাঠ দিয়ে এ ডিঙিটা তৈরী হয়ে থাকনা কেন, এখন তো একে কেউ ডিঙি ছাড়া আর কিছু বলবে না। এও ঠিক তেমনি শ্রীকান্ত, এও ঠিক তেমনি।

দেখা গেল সস্নেহে মৃত শিশুটিকে লইয়া ইন্দ্রনাথ নৌকায় শোয়াইয়া দিতেছে

তৃতীয় দৃশ্য

শাহজীর কুটীর

কুটীরের সম্মুখে বেড়া দেওয়া প্রশস্ত উঠান—চারিদিক বনাকীর্ণ ও নিস্তব্ধ। নিকটে কোন বসতি আছে তাহা মনে হয় না। কুটীরের পিছনে ঘাসবন, এই বনের পাশ দিয়া পায়ে চলা সরু পথ। দৃশ্য ঘুরিয়া আসার সঙ্গে দেখা গেল জনৈক ব্যক্তি দাওয়ায় বসিয়া ঝিমাইতেছে ও মধ্যে মধ্যে কাশিতেছে। তাহার মাথার জটা উঁচু করিয়া বাঁধা, গলায় বিবিধ প্রকারের ছোট বড় মালা। গায়ের জামা ও পরণের কাপড় মলিন এবং এক প্রকার হলদে রংয়ে ছোপান। লোকটা পাতলা গোছের অথচ দীর্ঘকায়। নাম শাহজী। দেখা গেল কুটীরের পেছনের পায়ে চলা পথ দিয়া একটি মধ্য বয়স্কা মহিলা প্রবেশ করিতেছে। তাহার পরণে হিন্দুস্থানী মুসলমানীর মত জামা-কাপড় গেরুয়া রংয়ে ছোপান। হাতে দু'গাছি গালার চুড়ি, সিঁথায় সিঁদুর, কাঁকালে মাটির কলসী। সে সম্মুখস্থ বেড়া ঠেলিয়া সোজা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণের মধ্যে ফুলের সাজির ন্যায় একটি ডালা লইয়া সে ঘর হইতে বাহিরে আসিল। তাহাকে যাইতে দেখিয়া শাহজী বলিল

শাহজী। আবার চললে কোথায়?

অন্নদা। এই কাছেই। একবারটি যাব আর চলে আসব।

শাহজী। সারাদিন তো শুধু যাওয়া আসাই করছো?

অন্নদা। কি করি বলো? শুধু ভাত তো আর তোমায় দিতে পারি না। তাই যা হোক, দুটো শাক-পাতা যোগাড় করে আনতে যাই!

শাহজী। থাক্ থাক্। সারাদিন নেশা ক'রে চোখ বুঁজিয়ে বসে আছি বলে তুই কি মনে করিস আমি কিছু দেখতে পাই না?

অন্নদা। আমার কি অন্যায় তুমি দেখেছ বল?

শাহজী। কেন তুই ঐ ছেলেটার কাছে টাকা নেওয়া বন্ধ করলি?

অন্নদা। ছেলেমানুষ, ও রোজ রোজ কোথায় টাকা পাবে বল?

শাহজী। যেখান থেকেই পাক, আনছিলো তো? তুই বারণ করাতেই তো সে আর আনে না, টাকা ছাড়া ওর সঙ্গে আমাদের কিসের সুবাদ?

অন্নদা। ও যে আমায় দিদি বলেছে—

শাহজী। ওঃ! দিদি বলেছে! ভারী আমার দিদি রে! ভায়ের ওপর অত যদি দরদ ঐ রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলবি। আমার এই উঠানের মাঝে ভাইকে নিয়ে আদিখ্যেতা করা চলবে না।

অন্নদা। (সবিস্ময়ে) আদিখ্যেতা!

শাহজী। নয় তো কি? টাকা নিয়ে আসে উঠোনের মধ্যে ঢুকতে পাবে। আমার নেশার খরচটা দিয়ে তারপর তোরা যা পারিস করগে যা।

শাহজী কাশিতে লাগিল, প্রবল কাশির ধমকে তাহার দম আট্‌কাইবার উপক্রম হইল। শাহজীকে কাশিতে দেখিয়া অন্নদা ব্যস্তভাবে ফিরিয়া আসিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। শাহজী শান্ত হইলে অন্নদা চলিয়া গেল। ইহার কিছুক্ষণ পরেই অপর দিক দিয়া ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত বেড়ার ঝাঁপ ঠেলিয়া প্রবেশ করিল।

ইন্দ্র। এই যে শাহজী!

শাহজী ইন্দ্রনাথের ডাকে চোখ খুলিল। চোখ দু'টি তাহার জবাফুলের মত রাঙা হইয়া আছে। সে ইন্দ্রনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিল—

শাহ্‌জী। আও ভেইয়া, আও বৈঠো।

ইন্দ্রনাথ শাহ্‌জীর কাছে গিয়া বসিল, শ্রীকান্ত তাহারই অদূরে দাঁড়াইয়া রহিল। শাহ্‌জী গাঁজার সাজ সরঞ্জাম ও কলিকাটি ইন্দ্রনাথের দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল—

শাহ্‌জী। তামাকু বানাও।

ইন্দ্রনাথ শাহ্‌জীর জন্য গাঁজা প্রস্তুত করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া শ্রীকান্ত সবিস্ময়ে চাহিয়াছিল—ইন্দ্র বলিল—

ইন্দ্র। কি রে শ্রীকান্ত—গাঁজা টেপা দেখে যে চোখ কপালে তুললি ?

শ্রীকান্ত। না তুলে আর উপায় কি ? বলি, তুমিও দু'টান দেবে নাকি ?

ইন্দ্র। দিলেই বা দোষ কি ?

শাহ্‌জী। হাঁ হাঁ বহুৎ আচ্ছা চিজ।

ইতিমধ্যে ইন্দ্রনাথের কলিকা সাজা হইয়া গিয়াছিল। সে কলিকাটি শাহ্‌জীর হাতে দিয়া কলিকার মুখে দেয়াশলাই কাঠি জ্বালিয়া দিল। শাহ্‌জী প্রাণপণে তাহা টানিয়া ইন্দ্রনাথের হাতে কলিকাটি ফিরাইয়া দিয়া কহিল—

শাহ্‌জী। পিও ভেইয়া পিও।

ইন্দ্র। না, আজ আর নয়—ওটুকু তুমিই শেষ কর।

শাহ্‌জী। (বিস্মিতভাবে) কেঁও—নেহি পিও গে ?

ইন্দ্র। না।

শাহ্‌জী কলিকাটি তুলিয়া লইয়া পুনরায় নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে বার কয়েক টান দিয়া পরে মাটিতে কলিকাটি উপুড় করিয়া রাখিল।

ইন্দ্রনাথ। দিদি কোথায় ?

শাহ্‌জী। জান্‌তা নেই। থোড়া আগাড়ি হিঁয়া থা। হামারা

সাথ বহুৎ বাতচিৎ করকে চলা গিয়া। হর্‌বখত ঘরমে আতা, বাহার যাতা। ও আওরৎ কা বাত্‌ ছোড় দেও।

শাহজী নেশায় ঢুলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তর কাছে আসিয়া বলিল—

শ্রীকান্ত। তুমি সেখানে যাবে না ইন্দ্র?

ইন্দ্র। কোথায়?

শ্রীকান্ত। তোমার দিদিকে টাকা দিতে।

ইন্দ্র। দিদির জন্যই তো বসে আছি, এই তো তাঁর বাড়ী।

শ্রীকান্ত। এই তোমার দিদির বাড়ী? এরা তো সাপুড়ে, মুসলমান!

ইন্দ্র। হ্যাঁ, সাপ খেলাব দেখবি শ্রীকান্ত?

শ্রীকান্ত। তুমি সাপ খেলাবে? কামড়ায় যদি?

ইন্দ্র। না না, ছাখ না কিচ্ছু করবে না।

শ্রীকান্ত শাহজীকে দেখাইয়া বলিল

শ্রীকান্ত। তা ওকে সঙ্গে না নিয়ে তুমি একা সাপে হাত দেবে?

ইন্দ্র। তাতে কি?

শ্রীকান্ত। হাজার হোক ও জাত-সাপুড়ে! ও সঙ্গে থাকলে তবু—

ইন্দ্র। ভয়টা কম থাকতো, এই বলতে চাস তো? দূর দূর ও ব্যাটা গাঁজাখোর! ও কি করবে?—দাঁড়া, সাপের ঝাঁপিটা নিয়ে আসি।

ইন্দ্রনাথ ঘরের দিকে চলিয়া যাইতে যাইবে এমন সময় উঠান দিয়া এক বিরাট সাপকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া শ্রীকান্ত লাফাইয়া উঠিল—

শ্রীকান্ত। ওরে! বাপ্‌ রে—

(ইন্দ্র শ্রীকান্তকে বলিল)

ইন্দ্র। ওকে দেখে অত ভয় পাসনে শ্রীকান্ত। ও কাউকে কিচ্ছু বলে না রে! বড্ড ভালোমানুষ, ওর নাম রহিম। (ইন্দ্র সাপটির কাছে গিয়া তাহার পেটটি ধরিয়া সরাইয়া দিতে দিতে বলিল)—যা রহিম যা, —(রহিম চলিয়া গেল।)

ইন্দ্রনাথ দৌড়াইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল ও অনতিকালের মধ্যে সাপের ঝাঁপি ও সাপুড়ের বাঁশী লইয়া উঠানে নামিয়া আসিল। ঝাঁপির ডালা একটুখানি খুলিয়া বাঁশিতে ফুঁ দিল।

(শ্রীকান্ত ভয়ে ভয়ে বলিল)

শ্রীকান্ত। ডালা খুলো না ইন্দ্র, ভেতরে যদি গোখ্‌রো সাপ থাকে?

ইন্দ্র। ওরে! গোখ্‌রো সাপই তো আমি খেলাই।

ইন্দ্রনাথ বাঁশী বাজাইয়া ডালাটি পুরো খুলিতেই গোখ্‌রো সাপ ফনা বিস্তার করতঃ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। ইন্দ্রনাথ ভয়ে পিছাইয়া গেল। পরে কোনক্রমে ঝাঁপিটি সম্পূর্ণরূপে উল্‌টাইয়া দিতে সাপটি চলিয়া গেল।

ইন্দ্র। এটা একেবারে বুনো, বুঝলি শ্রীকান্ত? আমি যাকে খেলাই, এটা সেটা নয়।

শ্রীকান্ত। কেন এমন কাজ কোরতে গেলে বল দেখি? এখন কোথায় গিয়ে যে সাপটা ঢুকলো তার ঠিক নেই!

ইন্দ্র। আমি দেখেছি ওটা ঘরের দিকে গেছে।

শ্রীকান্ত। দ্যাখ দেখি কি করলি? ও যদি বেরিয়ে শাহজীকে কামড়ায়?

ইন্দ্র। (নিরুপায়ভাবে) কামড়াক ব্যাটাকে, বুনো সাপ ধরে রাখে, গাঁজা-খোর শালার এতটুকু বুদ্ধি নেই!

ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তের উপরোক্ত কথার মাঝে অন্নদাদিদি যে কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন তাহা ইহারা কেহই লক্ষ্য করে নাই।

তাহার ডান হাতের ডালায় কতকগুলো শাক-সব্জি ও বাঁ কাঁকালে আঁটি বাঁধা কতকগুলো শুকনো কাঠ। তাহাকে দেখিয়াই ইন্দ্রনাথ বলিল

ইন্দ্র। এই যে দিদি! এসো না, এসো না—এসো না—ঐখানেই দাঁড়িয়ে থাকো।

অন্নদা। কেন? কি হল কী?

ইন্দ্র। তোমার ঘরে মস্ত বড় একটা সাপ ঢুকেছে।

অন্নদা কাঠের বোঝা ও হাতের ডালা দাওয়ায় নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন

অন্নদা। সাপুড়ের ঘরে সাপ ঢুকেছে—এতো বড় আশ্চর্য্য! কিন্তু কি করে সাপ ঢুকলো ইন্দ্রনাথ?

ইন্দ্র। ঝাঁপির ভেতর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

অন্নদা। উনি বুঝি ঘুমোচ্ছেন?

ইন্দ্র। হ্যাঁ, গাঁজা খেয়ে একেবারে অজ্ঞান হ'য়ে ঘুমোচ্ছে।

অন্নদা। ওঃ! আর সেই সুযোগে বুঝি তুমি তোমার এই বন্ধুটিকে সাপ খেলান দেখাতে গিয়েছিলে? এস, আমি ধরে দিচ্ছি।

ইন্দ্র। তুমি যেও না দিদি, তোমাকে খেয়ে ফেলবে। তুমি বরং শাহ্জীকে তুলে দাও। আমি তোমাকে কিছুতেই যেতে দেবো না।

ইন্দ্রনাথ দুইহাত প্রসারিত করিয়া অন্নদার পথরোধ করিল

অন্নদা। ও রে পাগলা! অত পুণ্যি তোর দিদির নেই। আমাকে খাবে না রে! এক্ষুনি ধরে এনে দিচ্ছি—ছাখ না!

* অন্নদা বাঁশের মাচা হইতে একটা কেরোসিনের ডিবা জ্বালিয়া লইয়া ঘরে ঢুকিলেন এবং এক মিনিটের মধ্যে সাপটাকে ধরিয়া আনিয়া ঝাঁপিতে বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্র টিপ করিয়া তাহার পায়ের উপর একটা নমস্কার করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বলিল

ইন্দ্র। তুমি যদি আমার আপনার দিদি হ'তে!

অন্নদা ইন্দ্রের চিবুক স্পর্শ করিয়া সস্নেহে কহিলেন

অন্নদা। ছিঃ দাদা! এমন কাজ আর কথখনো কোর না। এসব ভয়ানক জানোয়ার নিয়ে কি খেলা করতে আছে ভাই?

ইন্দ্র। আমি কি তেমনি বোকা দিদি? (হাতে বাঁধা শেকড় দেখাইয়া বলিল) এই ছাখ, আটঘাট সব বেঁধে রেখেছি। নইলে কি আজ আমাকে না ছুবলে ছেড়ে দিত? শাহজীর কাছ থেকে এটুকু আদায় কোরতে কি আমাকে কম বেগ পেতে হয়েছে? একটা বিষ পাথরের জন্য কতদিন ধরে তোমাদের বলছি আর তোমরা কেবলই পট্টি দিয়ে আজ নয়—কাল—কাল নয় পরশু, এমনি ক'রে ঘোরাচ্ছ। যদি নাই দেবে, সোজা বলে দাও না কেন, আমি আর আসব না।

অন্নদা। হ্যাঁ রে ইন্দ্র! তুই কি তোর দিদির বাড়ীতে শুধু সাপের মন্তর আর বিষ পাথরের জন্যেই আসিস রে?

ইন্দ্র। তা নয় তো কি? শাহজী তো আমাকে কেবলই ভোগা দিচ্ছে। এ তিথি নয়—ও তিথি। ও তিথি নয়—সে তিথি। সেই যে কবে একটু হাত চালার মন্তর দিয়েছিল, আর তো দিতেই চায় না। কিন্তু আমি আজ টের পেয়েছি দিদি, তুমিও বড় কম নও। তুমিও সব জান। আমি আর শাহজীকে খোসামোদ করছিনে। এবার তোমার কাছ থেকে সব মন্তর আদায় করে নিয়ে, তবে ছাড়ব। বুঝলি শ্রীকান্ত, শাহজী গাঁজা-টাজা খান বটে, কিন্তু তিন দিনের বাসি মড়া আধ ঘণ্টার মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন। এত বড় ওস্তাদ উনি! হ্যাঁ দিদি, তুমিও তো মড়া বাঁচাতে পারো? আচ্ছা দিদি, তুমি কটা মড়া বাঁচিয়েছ?

অন্নদা। আমি তো মড়া বাঁচাতে জানি না ইন্দ্রনাথ।

ইন্দ্র। কেন? তোমাকে এ মন্ত্র, শাহজী দেননি?

অন্নদা। না।

ইন্দ্র। এ বিদ্যে কি কেউ সহজে শিখিয়ে দিতে চায় দিদি। (অন্নদার প্রতি) আচ্ছা দিদি ঘরবন্ধন, দেহবন্ধন, ধুলোপড়া, এ-সব বোধহয় নিশ্চয়ই জান ?

অন্নদা। না রে ইন্দ্র! তোর দিদির এ-সব কানাকড়ির বিদ্যেও জানা নেই।

ইন্দ্র। নাই যদি জানবে তাহলে সাপটাকে অমন করে ধরলে কি কোরে ?

অন্নদা। ওটা শুধু হাতের কৌশল ইন্দ্র, কোন মন্ত্রের জোরে নয়। সাপের মন্ত্র আমরা সত্যিই জানিনে ভাই, যদি বিশ্বাস করিস তাহলে আজ তোর কাছে সব কথা খুলে বলে বুকখানা হাল্কা করি। বল্ আমার সব কথা বিশ্বাস করবি ? (ইন্দ্রনাথ নিরুত্তর)।

শ্রীকান্ত। ইন্দ্র যদি নাও করে, আমি তোমার সব কথাই বিশ্বাস কোরব দিদি! যা বলবে একটি কথাও অবিশ্বাস কোরব না।

অন্নদা। তোমরা যে ছেলে মানুষ ভাই, আমি জানি তোমরা আমার সব কথা বিশ্বাস করবে। বিশ্বাস কর ভাই যে, আমাদের আগাগোড়া সমস্তই ফাঁকি! (ইন্দ্রর প্রতি) আর তুমি মিথ্যে আশা নিয়ে শাহজীর পেছনে ঘুরে বেড়িও না ইন্দ্র, আমরা মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই জানি না, মড়াও বাঁচাতে পারি না, কড়ি চেলে সাপও ধরে আনতে পারি না। আর কেউ পারে কি না জানি না, কিন্তু আমাদের কোন ক্ষমতাই নেই।

ইন্দ্র। তা যদি নেই, তবে আমার কাছ থেকে তোমরা জোচ্চুরি করে এত টাকা ঠকিয়ে নিয়েছ কেন ?

অন্নদা। আমরা যে সাপুড়ে ভাই, ঠকানোই যে আমাদের ব্যবসা।

ইন্দ্র। ব্যবসা! ও! আচ্ছা দাঁড়াও না—ব্যবসা বার করে দিচ্ছি। চল রে শ্রীকান্ত, জোচ্চোর শালাদের ছায়া মাড়াতে নেই। হারামজাদা বজ্জাত ব্যাটারা।

ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তর হাত ধরিয়া টানিল। শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথের হাত ছাড়াইয়া টাকা ৫টি দাওয়ার উপরে রাখিয়া বলিল

শ্রীকান্ত। এই টাকা ৫টি ইন্দ্রনাথ আমাকে তোমার জন্যে আনতে বলে ছিল দিদি।

ইন্দ্রনাথ ছোঁ মারিয়া টাকা কয়টি তুলিয়া লইয়া বলিল।

ইন্দ্র। কী? আবার টাকা! জোচ্চুরি করে এরা আমার কাছ থেকে কত টাকা নিয়েছে, তা তুই জানিস না শ্রীকান্ত! এরা না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরুক—সেই আমি চাই।

শ্রীকান্ত। না ইন্দ্র, আমি দিদির নাম কোরে টাকা ক'টা এনেছি।

ইন্দ্র। ও ভারী দিদি! আয়।

ইন্দ্রনাথ টাকা কয়টা লইয়া শ্রীকান্তের জামার পকেটে দিল এবং শ্রীকান্তকে টানিয়া লইয়া চলিয়া যাইতেছিল, সহসা শাহজীর নেশার ঘোর কাটিয়া গেল। শাহজী বলিল

শাহজী। কেয়া হুয়া, কেয়া হুয়া?

ইন্দ্রনাথ তাহার সম্মুখে আস্তিন গুটাইয়া আসিয়া বলিল।

ইন্দ্রনাথ। ডাকু শালা, রাস্তায় তোমাকে দেখতে পেলে চাব্‌কে তোমার পিঠের চামড়া তুলে দেবো। বদমাইস ব্যাটা, কিছু জানে না—আর বলে বেড়ায় মন্তরের জোরে মড়া বাঁচায়গা! কখনও পথে দেখা হলে এবারে ভাল করে বাঁচাব তোমাকে—

সবেগে শ্রীকান্তকে লইয়া ইন্দ্রনাথ বাহির হইতে যাইবে এমন সময় শাহজী পরিষ্কার বাংলায় গম্ভীরভাবে ডাকিল

শাহজী। শোন ইন্দ্রনাথ!

ইন্দ্র। কি ?

শাহজী। তোমার কী হয়েছে বল তো ?

ইন্দ্র। হবে আবার কি ? তুমি একটি ঠগ, জোচ্চোর! তুমি শুধু এতদিন ধোঁকা দিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করেছ—তোমার কোন বিদ্যে জানা নেই। তুমি কিছু জান না।

শাহজী। জানিনে ? কে বললে তোমাকে জানিনে ?

ইন্দ্রনাথ অন্নদাদিদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া বলিল।

ইন্দ্র। ঐ বললে, তোমার কানা-কড়ির বিদ্যে নেই। বিদ্যে আছে শুধু জোচ্চুরি করবার আর লোক ঠকাবার। এই তোমাদের ব্যবসা! মিথ্যেবাদী জোচ্চোর কোথাকার!

ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্ত-সহ সবেগে বাহির হইয়া গেল। শাহজী উঠিয়া দাঁড়াইয়া অন্নদাকে সক্রোধে বলিল।

শাহজী। বলেছিস তুই একথা ?

অন্নদা কোন উত্তর দিল না। শাহজী সহসা একটি চেলা কাঠ তুলিয়া লইয়া—

শাহজী। কেন বললি ? কেন বললি হারামজাদী ?

শাহজী লাথি মারিয়া অন্নদাকে ফেলিয়া দিয়া নির্ম্মমভাবে প্রহার করিতে লাগিল। অন্নদা প্রহারের অসহ্য যাতনায় কাতরভাবে বলিতে লাগিল।

অন্নদা। ওগো! তোমার পায়ে পড়ি আমাকে এমনভাবে দগ্ধে দগ্ধে মেরো না। তার চেয়ে তুমি আমাকে একেবারে মেরে ফ্যালো।

শাহজী বজ্রমুষ্টিতে অন্নদার গলা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—

শাহজী। হ্যাঁ হ্যাঁ তাই ফেলবো, তোকে আমি একেবারে মেরে ফেলবো।

ইতিমধ্যে ইন্দ্রনাথ ক্ষিপ্রগতিতে ছুটিয়া আসিল ও শাহজীর বাহু অন্নদাদিদির গলা হইতে মুক্ত করিয়া শাহজীকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। শাহজীর সহিত ইন্দ্রনাথের ততক্ষণে ঘোর মল্লযুদ্ধ বাঁধিয়া গিয়াছে। ইন্দ্রনাথকে তখন বলিতে শোনা গেল।

ইন্দ্র। হারামজাদা জানোয়ার! আজ তোকে শেষই করে ফেলবো।

মল্লযুদ্ধ যখন বেশ পাকিয়া উঠিয়াছে, ইহারই মাঝে শ্রীকান্তকে ছুটিয়া আসিতে দেখা যায় ও বহু টানা-টানি করিয়া ইন্দ্রনাথ ও শাহজীকে পৃথক করিতে চেষ্টা করে। ইন্দ্রনাথ হাঁটু গাড়িয়া শাহজীর বুকের উপর বসিয়া পড়ে। দেখা যায়, মল্লযুদ্ধের মাঝে সাপমারা বর্শা লইয়া শাহজী কখন যে ইন্দ্রনাথের পিঠে খোঁচা মারিয়াছে ইন্দ্রনাথ তাহা টেরও পায় না। ইন্দ্রনাথ শাহজীকে পা দিয়া চাপিয়া ধরে এবং উঠিয়া দাঁড়ায়। শ্রীকান্ত বলে—

শ্রীকান্ত। একি! এ যে রক্ত!

ইন্দ্র। হ্যাঁ রক্ত, শালা গাঁজাখোর ঐ সাপমারা বর্শা দিয়ে কোন্ সময়ে যে খোঁচা মেরেছে, টেরও পাইনি।

ইত্যবসরে শাহজী উঠিবার চেষ্টা করে, ইন্দ্রনাথ তাহাকে শাসাইয়া বলে।

ইন্দ্র। খবরদার!—ভাখ শ্রীকান্ত, এ শালার ঐ কাপড়টা দেতো—বেশ ক'রে এর হাত পা বেঁধে দিই। হাত পা না বাঁধলে, একে বিশ্বাস নেই, ছাড়া পেলেই হয়তো মেরে বসবে!

ইন্দ্রনাথ শাহজীর হাত পা বাঁধিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। পরে অন্নদাদিদির চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়া তাহার জ্ঞান ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ইন্দ্র। শ্রীকান্ত নজর রাখ। ঐ গাঁজাখোর শালা যেন না ওঠে। দিদি ওকে কাঠ কুড়িয়ে, ঘুঁটে বেচে খাওয়াচ্ছে, গাঁজার পয়সা দিচ্ছে,

এতোতেও ওর হয় না। আমি ওকে পুলিশে দেবো, নইলে ও কোন্ দিন দিদিকে খুন করে ফেলবে।

ইতিমধ্যে অন্নদাদিদি জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া বলিল—

অন্নদা। খুন ক'রে ফেলাই ভাল ভাই—খুন ক'রে ফেলাই ভাল। তাহলে তো সব জ্বালা-যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই।

অন্নদা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। পরে শাহজীর নিকট গিয়া তাহাকে বন্ধন-মুক্ত করিয়া দিয়া বলিল—

অন্নদা। যাও, ঘরে যাও।

শাহজী ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। অন্নদাদিদি ইন্দ্রনাথের ডান হাত মাথার উপর টানিয়া লইয়া বলিলেন

অন্নদা। এই আমার মাথায় হাত দিয়ে শপথ কর্ ভাই, আর কখনো এ বাড়ীতে আসবিনে—আমাদের যা হবার হবে।

ইন্দ্র। ওঃ! আমাকে যে ও খুন করতে গিয়েছিল, সেটা বুঝি কিছু না? আর আমি ওকে বেঁধে রেখেছিলাম ব'লে তোমার এত রাগ? এমন না হ'লে আর কলিকাল বলেছে কেন? তোমাদের মতন নেমক-হারাম আমি জীবনে দেখিনি! আয় শ্রীকান্ত, আর নয়। (দু'এক পদ অগ্রসর হইয়া অশ্রুসজল নেত্রে কহিল) আর আসব না—হয়েছে তো—আর আসব না—

ইন্দ্রনাথ বাহির হইয়া গেল। শ্রীকান্ত তাহাকে অনুসরণ করিল। ইন্দ্রনাথের অলক্ষ্যে শ্রীকান্ত ফিরিয়া টাকা কয়টি অন্নদাদিদির সম্মুখে রাখিয়া হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল। অন্নদাদিদির তাহা চক্ষু এড়াইল না। তিনি ব্যাকুলভাবে চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

নদীতীর

একটি ঘাটে ইন্দ্রনাথের ডিঙি নৌকোখানি বাঁধা আছে। তাহারই অদূরে পাড়ের উপরে জনৈক সৌখীন যুবককে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। ইনি ইন্দ্রনাথের মাসতুতো ভাই। কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। এঁর পায়ে সিল্কের মোজা, চকচকে পাম্পসু। আগাগোড়া ওভারকোটে মোড়া, গলায় গলাবন্ধ, হাতে দস্তানা, মাথায় টুপি। পশ্চিমের শীতের বিরুদ্ধে তাহার সতর্কতার অন্ত নাই। দৃশ্য আরম্ভ হইলে দেখা গেল, বাবুটি যেন কাহার অপেক্ষায় ইতঃস্তত পদচারণা করিতেছেন। ইতিমধ্যে ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত র‍্যাপার মুড়ি দিয়া দুইখানি দাঁড়, পাল টাঙাইবার ও গুণ টানিবার সরঞ্জামাদি লইয়া প্রবেশ করিল। তাহাদিগকে দেখিয়া নতুনদা বলিলেন।

নতুনদা। কি রে! এত দেরী করলি কেন?

(ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তকে দেখাইয়া)

ইন্দ্রনাথ। এই একে ডেকে আনতে দেরী হয়ে গেল নতুনদা। স্রোতের বিপক্ষে যাওয়া, দুজনে দাঁড় না টানলে নৌকো নিয়ে এগোনই যাবে না। তারপর যদি পাল খাটাতে হয়, কি গুণ টানতে হয়, তার সব ব্যবস্থা করে নিয়ে আসতে দেরী হয়ে গেল।

নতুনদা। যাক, যা করেছিস—করেছিস। নে এখন চল, আমি না গেলে তাদের থিয়েটারই হবে না।

(সহসা শ্রীকান্তের দিকে নজর পড়িতেই)

নতুনদা। এই! তোর নাম কি রে?

শ্রীকান্ত। শ্রীকান্ত।

নতুনদা। (দাঁত খিঁচাইয়া) এ্যাঁ! এমনি কান্তে হয় না—আবার শ্রীকান্ত, শুধু কান্ত। নে তামাক সাজ। ইন্দ্র হুঁকো কলকে এনেছিস?

ইন্দ্র। হ্যাঁ, নতুনদা।

নতুনদা। তাহলে দে ছোঁড়াটাকে—তামাক সাজুক।

ইন্দ্র। নৌকোটা ছেড়ে দিই, শ্রীকান্ত হাল ধরুক, আমি বরং তোমাকে তামাক সেজে দিচ্ছি।

নতুনদা। না না, তার দরকার নেই। আগে তামাকটা দে, তারপর নৌকোটা ছাড়। মৌজ করে বসা যাক।

ইন্দ্র। আচ্ছা।

ইন্দ্রনাথ তামাক সাজিতে উদ্যত হইল, শ্রীকান্ত তাহাকে বাধা দিয়া বলিল

শ্রীকান্ত। না-না, নতুনদা আমাকে যখন বলেছেন, তখন আমিই তামাক সেজে দিচ্ছি।

নতুনদা। বাঃ বাঃ! ছোঁড়াটার বুদ্ধি আছে। বুঝলি কান্ত, এল-এ পাস করেছি। আর দুবছর পরে বি-এ পাস করে যখন ডেপুটি হব, তখন তোকে এই তামাক সাজার জন্যে আমার কোর্টের একটা পিয়াদা টিয়াদার চাকরি জুটিয়ে দেবো। এই তোর গায়ে ওটা কি রে? র‍্যাপার?

শ্রীকান্তর এতক্ষণে তামাক সাজা হইয়া গিয়াছে। সে কলিকাতে ফুঁ দিতে দিতে বলিল

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ।

নতুনদা। আহা! র‍্যাপারের কি ছিরি! তেলের গন্ধে ভূত পালায়। ওটা খুলে দেতো—পেতে বসি। খালি কাঠের ওপর বসতে কষ্ট হচ্ছে।

শ্রীকান্ত গায়ের র‍্যাপারটি খুলিয়া দিতে উদ্যত হইলে ইন্দ্রনাথ নিজের গায়ের র‍্যাপারটি খুলিয়া দিয়া বলিল—

ইন্দ্রনাথ। এই নাও নতুনদা, আমার শীত কচ্ছে না।

নতুনদা ইন্দ্রনাথের র‍্যাপারটি বেশ করিয়া পাতিয়া বসিলেন। ইতিমধ্যে শ্রীকান্ত কলিকাটি হুঁকাতে লাগাইয়া হুঁকাটি আগাইয়া দিল। নতুনদা কয়েকটা টান দিয়া বলিলেন

নতুনদা। নে, এইবার নৌকো ছাড়।

নৌকো ছাড়া হইল। নৌকো চলিতে লাগিলে শ্রীকান্ত বলিল

শ্রীকান্ত। পালটা খাটিয়ে নিলে হতো না ইন্দ্র ?

ইন্দ্র। হাওয়া পড়ে গেল, আর তো পাল চলবে না শ্রীকান্ত !

নতুনদা। এই ছোঁড়াটাকে দে না, দাঁড় টানুক।

ইন্দ্র। দাঁড়? কারুর সাধ্য নেই নতুনদা যে, এই রেত্‌ ঠেলে উজান বয়ে যায়। আজ যা নদীর অবস্থা, দেখে মনে হচ্ছে সেখানে গিয়ে আজ আর পৌঁছান যাবে না, হয়তো এখান থেকেই আমাদের ফিরতে হবে।

নতুনদা ইন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বলিলেন

নতুনদা। কি? ফিরে যেতে হবে? তবে আনলি কেন রে হতভ[illegible] যেমন করে হোক তোকে পৌঁছে দিতেই হবে।

শ্রী[illegible]ান্ত। ইন্দ্র! গুণ টেনে নিয়ে গেলে হয় না ?

নতুনদা। (মুখ ভেঙ্‌চাইয়া) তবে যাও না হে ছোকরা! টান গে না। জানোয়ারের মতন বসে থাকা হচ্ছে কেন ?

গুণের দড়ি লইয়া শ্রীকান্ত পাড়ে লাফাইয়া পড়িল ইন্দ্রনাথ বলিল

ইন্দ্র। তুমি ততক্ষণ হালটা একটু ধর ত নতুনদা! আমি গুণের দড়িটা ঠিক করে বেঁধে নিই।

নতুনদা। হ্যাঁ তোমার কথা শুনে, এই ঠাণ্ডায় হাতের দস্তানা খুলে নিউমোনিয়া বাধাই আর কি ?

ইন্দ্র। না না, দস্তানা খুলবে কেন? না খুলেই ধর না।

নতুনদা। হ্যাঁ! তোমার কথা শুনে দামী দস্তানাটা মাটি করে ফেলি আর কি? নে নে, তোরা যা পারিস কর।

ইন্দ্রনাথ গুণের দড়ি ঠিক করিয়া হাল ধরিয়া রহিল। শ্রীকান্ত প্রাণপণে নৌকোটিকে টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল ইহারই মাঝে নতুনদা বলিয়া ওঠেন

নতুনদা। তোরা যদি নৌকো টেনে নিয়ে যেতে পারবি নে, তাহলে সে কথা আগে বললি নে কেন?

ইন্দ্র। (ভয়ে ভয়ে) বললুম তো নতুনদা, কিন্তু তুমি যে—

নতুনদা। (ধমক দিয়া) থাক্ আর বিগ্গে জাহির করতে হবে না।

(সহসা হাত ঘড়ির দিকে নজর করিয়া)

নতুনদা। ওঃ! রাত্তির দশটা বেজে গেল! কখন যে পৌছুব তার ঠিক নেই। ক্ষিধেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। এই, এখানে কোথাও নৌকোটা বেঁধে মুড়ি টুড়ি পাওয়া যায় কিনা ভাখ।

ইন্দ্র। সামনেই একটা বস্তি আছে।

নতুনদা। তবে নৌকো ভেড়া।

ইন্দ্র। (উচ্চৈস্বরে) শ্রীকান্ত! এই বস্তিতে আমরা নৌকোটা ভেড়াব। তুই গুণের দড়ি টেনে নিয়ে আয়—

দেখা গেল ইন্দ্রনাথ নৌকোর মুখ ঘুরাইয়া দিল। শ্রীকান্ত গুণের দড়ি গুটাইতে লাগিল, নৌকো ঘাটে ভিড়িল।

নতুনদা। যা—খাবার টাবারের চেষ্টা ভাখ। কাছে পয়সা কড়ি আছে তো?

ইন্দ্র। আছে আনা আষ্টেক।

ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত চলিয়া যাইতে যাইবে এমন সময় নতুনদা তাহাদের ডাকিলেন।

নতুনদা। এই তোরা নৌকোর কাছে এসে একটু দাঁড়া, তোদের কাঁধে ভর দিয়ে নামি, ঠায় একভাবে অনেকক্ষণ বসে থেকে, হাত পা সব ধরে গেছে। একটু খেলান চাই। (ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তের কাঁধে ভর দিয়া নতুনদা ডাঙায় আসিয়া নামিলেন ও কহিলেন) তা তোরা দুজনে যাচ্ছিস্ কোথায়? এই ছোঁড়াটাকে পাঠিয়ে দে না, যা হোক কিছু কিনে নিয়ে আসুক।

ইন্দ্র। ও তো এ গ্রামের কিছু চেনে না নতুনদা, তা শ্রীকান্ত না হয় তোমার কাছে থাক্, আমি একাই নিয়ে আসছি।

শ্রীকান্ত। না ইন্দ্র আমি তোমার সঙ্গেই যাব।

ইন্দ্র। তা তুমিও চল না নতুনদা আমাদের সঙ্গে। একলা থাকতে তোমার যদি ভয় করে।

নতুনদা। কি? ভয়? আমরা দর্জ্জিপাড়ার ছেলে! যমকে ভয় করি না তা জানিস? তা'বলে ছোট লোকদের dirty পাড়ার মধ্যেও আমরা যাইনে।

ইন্দ্র। তাহ'লে আমরা ঘুরে আসি।

নতুনদা। কেন? দুজন না গেলে বুঝি তোদের চলবে না?

ইন্দ্র। কি করবো নতুনদা! শ্রীকান্ত যে কিছুতেই থাকতে চাইছে না।

নতুনদা। না থাকতে চায় যাক। দরকার নেই আমার কাউকে — (ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত চলিয়া গেল, নতুনদা নদীর পাড়ে পদচারণা সুরু করিলেন ও নাকি সুরে গান ধরিলেন। 'ঠুন্ ঠুন্ পেয়ালা বাজে।' সহসা কয়েকটি কুকুরের সমবেত চীৎকার শোনা গেল। নতুনদা ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া নদীর পাশের একটি ঝোপের মাঝে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কুকুরের চীৎকার ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। নতুনদা ঝোপ হইতে বাহির হইয়া নদীর পাড় ভাঙ্গিয়া ছুটিতে লাগিলেন।

পায়ের একপাটি পাম্পস্থ কাদা বালিতে পুঁতিয়া গেল। যেদিক হইতে কুকুরের আওয়াজ আসিতেছে নতুনদা তাহার উল্টাদিকে ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। সহসা দুইদিক হইতেই কুকুরের চীৎকার শোনা যাইতে লাগিল। নতুনদা অনন্যোপায় হইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। কুকুরের চীৎকার আরও বর্দ্ধিত হইল। ইতিমধ্যে ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত কথা কহিতে কহিতে ফিরিয়া আসিল।)

ইন্দ্র। খুব ঠেঙাতিস্ বুঝি ?

শ্রীকান্ত। হাঁ। আমার হাতের কিল-চড় খেয়ে চুপ করে বসে থাকত।

ইন্দ্র। বাড়ী গিয়ে নালিশ করত না ?

শ্রীকান্ত। না। রাজলক্ষ্মী যে আমায় ভালবাসত।

ইন্দ্র। কি নাম বল্লি ?

শ্রীকান্ত। রাজলক্ষ্মী।

ইন্দ্র। ও রে শ্রীকান্ত! কুকুর ডাকছে। নতুনদাকেও দেখতে পাচ্ছি না, এ সময়ে এদিকে বাঘ বেরোয়। কী হোল বল্‌তো ? নতুনদাকে বাঘে-টাঘে ধরল না তো ?

শ্রীকান্ত। কি জানি ? তোর কথা শুনে সত্যিই ভয় করছে। নৌকো তো ঘাটেই বাঁধা রয়েছে। তা ভয়ে কোথাও লুকিয়ে টুকিয়ে থাকেননি তো ?

ইন্দ্র। কি জানি, একটু ডেকে দেখবো ?

শ্রীকান্ত। ত্থাখ্ তো বালির ওপর কী যেন একটা চক্‌চক্ করছে।

(উভয়ে বালির নিকট ছুটিয়া গেল। ইন্দ্রনাথ একপাটি পাম্পস্থ তুলিয়া লইয়া বলিল)

ইন্দ্র। শ্রীকান্ত রে! যা ভেবেছি তাই, এযে নতুনদারই জুতো !

(সহসা কুকুরের ডাক পুনরায় প্রবল হইল)

ইন্দ্র। ঐ শোন্ শ্রীকান্ত! কুকুরগুলো চেঁচাচ্ছে—নিশ্চয়ই নেকড়ে-গুলো টেনে নিয়ে গিয়ে এতক্ষণে নতুনদাকে খেয়ে ফেললো। তুই থাক্ শ্রীকান্ত, আমি ফিরে না এলে তুই বাড়ীতে গিয়ে খবর দিস্। আমি চল্লুম।

(ইন্দ্রনাথ একটি বাঁশ হাতে লইয়া যাইতে যাইবে এমন সময় শ্রীকান্ত বলিল —)

শ্রীকান্ত। তোকে আমি একা ছেড়ে দেবো না। আমিও তোর সঙ্গে যাব।

ইন্দ্র। তুই ক্ষেপেছিস শ্রীকান্ত, তোর দোষ কি? তুই কেন যাবি?

শ্রীকান্ত। তোমারই বা দোষ কি ইন্দ্র? তুমিই বা কেন যাবে?

ইন্দ্র। দোষ আমারও নেই ভাই। নতুনদাকে আমি আনতেও চাইনি। কিন্তু একলা যে আমি ফিরে যেতে পারবো না।

(কাঁদিয়া ফেলিল)

(সহসা নদীর অপর একপ্রান্তে কুকুরের সমবেত চীৎকার শোনা গেল।)

শ্রীকান্ত। কুকুরগুলো ওই দিক থেকেই বেশী চীৎকার কচ্ছে। চল ইন্দ্র, আমরা ওই দিকেই যাই।

(শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ উভয়ে কিছুদূর অগ্রসর হইতেই শ্রীকান্ত বলিল—) ভাখ তো ইন্দ্র, জলের মাঝে কালোপানা কি যেন একটা দেখা যাচ্ছে।

ইন্দ্র। তাইতো! (ডাক দিলো) নতুনদা—

(নতুনদা কাঁদ কাঁদ স্বরে জবাব দিলেন)

নতুনদা। এই যে আমি এইখানে।

(ইন্দ্র শ্রীকান্তকে বলিল)

ইন্দ্র। তুই এখানে দাঁড়া শ্রীকান্ত, নতুনদাকে আমি জল থেকে তুলে নিয়ে আসি।

(জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং ক্ষণকালের মধ্যেই নতুনদাকে ডাঙ্গায় তুলিয়া আনিল। নতুনদার সর্ব্বাঙ্গ জলে ভিজিয়া গিয়াছে। ইন্দ্রনাথেরও সেই অবস্থা। ডাঙ্গায় উঠিয়া নতুনদা কহিলেন—)

নতুনদা। আমার একপাটি পাম্প—

ইন্দ্র। সেটা ওখানে পড়ে আছে।

(শ্রীকান্ত নিজের গায়ের র‍্যাপারটা নতুনদার দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল—)

শ্রীকান্ত। ভিজে জামা কাপড় ছেড়ে, আমার এই র‍্যাপারটা পরুন নতুনদা, আর ইন্দ্রর র‍্যাপারটা নৌকোয় আছে, সেটা গায়ে জড়িয়ে নিন, নইলে শীতে আপনার বড় কষ্ট হবে।

নতুনদা। থাম্ থাম্ আর উপদেশ দিতে হবে না। তোদের পাল্লায় পড়ে জামা কাপড়গুলো সব গোল্লায় গেল, এখন উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। তোরা সব চাষা, তোদের সঙ্গে আসাই আমার অন্যায় হয়েছে। এ দামী জামা কাপড়ের মূল্য তোরা কি বুঝবি? (নতুনদা ভিজা জামা কাপড় নিঙড়াইতে লাগিলেন, ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত তাঁহারই সম্মুখে অপরাধীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।)

পঞ্চম দৃশ্য

শাহজীর কুটীর

শাহজী একটা সাপকে চলে যেতে দেখে তাহাকে তাড়া করে। অন্নদা ছুটে এসে বারণ করে—

অন্নদা। নেশার ঝোঁকে ওকি ক'রছো? ওটা যে একেবারে বুনো। (শাহজী সাপটাকে তৎক্ষণে ধ'রে বিকট হেসে চুমকুড়ি দেয়। সাপটা শাহজীকে ছোবল মারে।)

অন্নদা। ওগো ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—

শাহজী। ছেড়ে দেব? শত্রুকে শেষ ক'রে তবে ছাড়বো। (সাপটাকে দু'আধখানা ক'রে শাহজী ঢলে পড়ে—ইতিমধ্যে ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত ছুটিয়া আসে—)

ইন্দ্র। কি হোল দিদি? কি হোল!

অন্নদা। শেষ! সব শেষ।

(মঞ্চের আলো নিভিয়া যায় ও ক্ষণকালের মধ্যেই ধীরে ধীরে মঞ্চের আলো জ্বলিয়া ওঠে। দেখা যায়, তখন অপরাহ্নকাল, অন্নদাদিদি একাকিনী দাওয়ায় বসিয়া আছেন। আজ তাঁহার সম্পূর্ণ বৈধব্যের বেশ। হাতে গালার চুড়ি বা নোয়া আজ আর কিছুই নাই। সিঁথায় যে সিঁদুর জ্বল্‌জ্বল্ করিত আজ তাহা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার দৃষ্টি উদাস! গভীর বেদনায় আজ তিনি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। মধ্যে মধ্যে চোখের জল তিনি আচলে মুছিতেছিলেন। ইতিমধ্যে জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে বেড়ার ঝাঁপ ঠেলিয়া উঠানে প্রবেশ করিতে দেখা যায়। তাহার গামছায় একরাশ ফুল।)

নটবর। দিদি! দিদি!

অন্নদা। এই যে এসেছ নটবরদা?

নটবর। হ্যাঁ দিদি, এই নাও তোমার ফুল।

(ফুলগুলি গামছা হইতে দাওয়ায় ঢালিয়া দিল।)

অন্নদা। মাকড়ীজোড়া বিক্রী হয়েছে তো?

নটবর। হ্যাঁ, একুশ টাকায় বিক্রী করেছি।

অন্নদা। তোমার কাছে যা দেনা ছিল ঐ টাকায় তা সব শোধ হয়েছে তো?

নটবর। হ্যাঁ তা হয়েছে। আমার কাছে তোমার দেনা ছিল ২০॥৶১০ আনা। আর এই নাও তোমার ।/১০ আনা ফিরেছে।

(নটবর ।/১০ আনা অন্নদার হাতে দিল।)

নটবর। তা কাল সবেমাত্র শাহজী মারা গেল। তোমার মনের এখন এই অবস্থা; সাত তাড়াতাড়ি তুমি দেনা শোধ করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন দিদি? আমি তো আর তোমায় তাগাদা দিইনি।

অন্নদা। না নটবরদা তা দাওনি। আমি আজই এই গ্রাম ছেড়ে চলে যাব কিনা তাই।

নটবর। কিন্তু তুমি এখান থেকে চলে যেতে চাইছ কেন? আমরা তো রয়েছি।

অন্নদা। তা জানি। তোমাদের ভরসাতেই তো এতদিন এখানে ছিলাম। কিন্তু এখন ঐ কবরকে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়।—(কাঁদিতে লাগিল।)

নটবর। সে কথা ঠিক। একজনের অভাব আর একজনের পক্ষে সহ্য করে বাস করা খুবই কষ্টকর।

অন্নদা। কাল যখন তাঁকে কবর দিয়ে নেয়ে ফিরে এলাম তখন মনে হোল, ঐখান থেকেই যে দিকে দুচোখ যায়, চলে যাই। কিন্তু

ইন্দ্রনাথ আর শ্রীকান্ত কিছুতেই ছাড়লে না। এখন ভেবে দেখছি, ইন্দ্রনাথ তখন যেতে না দিয়ে আমার ভালই করেছে। নইলে ঋণ শোধ করার জন্য আবার হয়ত আমাকে ফিরে আসতে হ'তো।

নটবর। সত্যি, ছেলেটি তোমাদের বড়ই ভালবাসে। একদিন বাড়ী ফেরার পথে ইন্দ্রনাথ আমার দোকানে দাঁড়িয়ে বলে গেল, শাহজীর মত ওস্তাদ এ তল্লাটে নেই। ওর কাছে যদি কিছু আদায় কোরতে পারি তো বুঝবো যে একটা কাজ কোরলাম।

অন্নদা। আদায় কোরতে এসে সে শুধু ঠকেছে। ইন্দ্রনাথকে আর কিছু বলারও মুখ নেই। তাই, তার বন্ধু শ্রীকান্তর নামে আমি একটা চিঠি লিখে রেখেছি। এই চিঠিখানা তার কাছে তুমি পৌছে দিও নটবরদা।

নটবর। চিঠি লিখেছ? তাহলে তুমি তো লেখাপড়া জান দিদি?

অন্নদা। জানি সামান্য।

নটবর। আজ তোমার কথা শুনে, তোমার ব্যাপার স্যাপার দেখে বড় খট্‌কা লাগছে।

অন্নদা। লাগবারই কথা। যাই, ফুলগুলো কবরে দিয়ে বেলা থাকতে থাকতে বেরিয়ে পড়ি।

নটবর। তোমায় থাকতে বলি সে উপায় আমার নেই দিদি। তুমি যদি হিঁদুর মেয়ে হ'তে তাহলে আমি তোমাকে আমার ঘরেই ঠাঁই দিতাম। কিন্তু কি ক'রবো? উঠোনের এই বেড়া যদিও বা ভাঙা যায় দিদি! জাতের বেড়া ভাঙা যায় না। আমি যাই, তোমার চিঠিখানা পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা করি।

(নটবর গামছায় চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল। অন্নদা নীরবে কিছুক্ষণ অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে অপরদিক হইতে ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত প্রবেশ করিল। তাহাদের দেখিয়া অন্নদা তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বলিলেন)

অন্নদা। এই যে, তোমরা এসেছ!

ইন্দ্র। বা রে! কাল তোমাকে এই অবস্থায় রেখে গেলাম, আসব না? অত কোরে তোমায় বললাম দিদি যে, আমার মা রয়েছেন, তুমি আমাদের বাড়ীতে চল, তোমার কোন কষ্ট হবে না কিন্তু তুমি কিছুতেই গেলে না।

অন্নদা। তাকি হয় ভাই? আমি যে মুসলমান।

ইন্দ্র। কিন্তু আমার মন ব'লছে—তুমি হিন্দুর মেয়ে। নইলে তুমি কাল অমন কোরে নোয়া জলে ফেলে দিয়ে মাটি দিয়ে সিঁদুর তুলে গঙ্গাস্নান কোরলে কেন?

অন্নদা। তুমি ঠিকই ধ'রেছো ভাই। কিন্তু শাহজী সত্যই আমার স্বামী ছিলেন।

ইন্দ্র। (সন্দিগ্ধভাবে) শাহজী স্বামী ছিল, কিন্তু তুমি যে হিন্দুর মেয়ে দিদি!

অন্নদা। ভাবছ শাহজীকে বিয়ে কোরলাম কি কোরে? বোলব ভাই, সবই বোলব। বস, (ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত ও অন্নদা উপবেশন করিল) আমার এই কথাটি শুধু জেনে রাখ, তিনি যখন জাত দিলেন তখন আমারও সেইসঙ্গে জাত গেল।

ইন্দ্র। সে আমি বুঝতে পেরেছি দিদি। আর সেইজন্যই তো আমার মনে যখন তখন সন্দেহ হয়েছে, তুমি হিঁদুর মেয়ে। কিন্তু আজ আর আমি তোমার কোন কথা শুনব না—তোমাকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে।

অন্নদা। তা হয় না ইন্দ্রনাথ! সাপের সঙ্গে এতকাল বাস করেছি, এখন নেউলের ঘরে ফিরে গেলে আর এক অশান্তির সৃষ্টি হবে। শ্রীকান্ত! তুমি সেদিন আমায় যে পাঁচটী টাকা দিয়ে গিয়েছিলে, সে পাঁচটী টাকা, ওই নটবর মুদির হাতে একটু আগেই ফিরিয়ে

দিয়ে গেলাম। কেন দিলাম, সেই সঙ্গে তোমায় একটা চিঠি লিখে দিয়ে গেলাম। যে ক'দিন বেঁচে থাকব তোমার দয়ার কথা আমি কোনদিনই ভুলতে পারব না ভাই। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার বুকের ভিতর বসে ভগবান চিরদিন যেন এমনি করে দুঃখীর জন্যে চোখের জল ফেলান।

শ্রীকান্ত। আমার টাকা তুমি ফিরিয়ে দিয়েছ দিদি ?

অন্নদা। হ্যাঁ, ভেবে দেখলাম ওর প্রয়োজন আজ ফুরিয়েছে। শুধু শুধু তোমার টাকা কটা নিয়ে আর কি কোরবো ভাই।

ইন্দ্র। (অভিমানভরে) শ্রীকান্তকে কি চিঠি লিখেছ জানতে পারি কি ?

অন্নদা। এসেই যখন পড়েছ, তখন নিশ্চয়ই জানতে পারবে ভাই। তোমাকে চিঠি না লিখে শ্রীকান্তকে কেন চিঠি লিখেছি, তার কৈফিয়ৎ আগে আমাকে দেওয়া দরকার। তোমাকে চিঠি দিতে সাহস করিনি, কেন না তোমার কাছে আমরা এতদিন শুধু প্রতারণাই কোরে এসেছি। মনে করেছিলাম শ্রীকান্তর কাছ থেকে তুমি সব জানতে পারবে। তুমি মানুষের আশীর্ব্বাদের বাইরে! তাই আশীর্ব্বাদ কোরতেও তোমায় সাহস হয় না। তবে ভগবানের শ্রীচরণে তোমাকে আজ মনে মনে সঁপে দিলাম। তিনি যেন তোমাকে আপনার ক'রে নেন।

ইন্দ্র। ভগবান কোনদিন আপনার ক'রে নেবেন কিনা জানি না। তুমি আমাকে আপনার ক'রে নাও দিদি!

অন্নদা। তোমাকে আপনার করে নিই ইন্দ্র, এ ক্ষমতা আমার নেই। আমার জীবনের ইতিহাস শুনলে, তুমিও হয়ত আমাকে আপনার করে নিতে সাহস করবে না। মনে রেখো, তোমাদের এই দুঃখিনী দিদির নাম অন্নদা।

ইন্দ্র। (সবিস্ময়ে) অন্নদা!

অন্নদা। হ্যাঁ, আর শাহজী আমার বিবাহিত স্বামী! আমরা উভয়েই ব্রাহ্মণ-সন্তান! আর পাঁচজনের মত আমাদেরও উলু দিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে, ঘটা ক'রে বিয়ে হ'য়েছিল।

শ্রীকান্ত। শাহজী ব্রাহ্মণ! তবে ব্রাহ্মণ সন্তানকে অমন ক'রে কবর দিলে কেন দিদি?

অন্নদা। হিন্দুর আচারে সৎকার কোরলে পাছে সব ফাঁস হয়ে যায়, সেই ভয়ে। ছদ্মবেশী যাযাবরী জীবন, যে জীবনের পরিণামে আছে শুধু অনন্ত দুর্গতি, তার জীবনের ধর্ম্মই বা কি, আর সামাজিক আচার বিচারই বা কি?

ইন্দ্র। শাহজী ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল?

অন্নদা। হ্যাঁ ভাই! খুনের আসামী, ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ান ছাড়া তার আর উপায় কি ছিল?

ইন্দ্র। শাহজী খুন কোরেছিল?

অন্নদা। হ্যাঁ, আমার নিজের মায়ের পেটের বিধবা বড় বোনকে।

শ্রীকান্ত। (চম্‌কে) সে কি!

ইন্দ্র। উনি খুন কোরতে গেলেন কেন?

অন্নদা। না কোরে উপায় ছিল না। তোমরা ছেলে মানুষ; তোমাদের কাছে সে ঘটনা আজ আমি খুলে বোল্‌তে পারব না। এই ঘটনার পর উনি হ'লেন নিরুদ্দেশ। বাবা ছিলেন, রাশভারী মানুষ। তিনি তার সন্তানঘাতীকে খুঁজে বার করার জন্যে পুলিশ লাগালেন কিন্তু তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল না, এর সাত বছর পরে তোমরা যেমন বেশে তাঁকে দেখেছ, তেমনি বেশেই সহসা একদিন আমি তাঁকে দেখতে পেলাম। আসল মানুষটা তখন মরে গিয়ে শাহজী হ'য়েছে। আমাদের বাড়ীর সামনে শাহজী সাপুড়ে একদিন সাপ খেলাচ্ছিল, তাকে আর কেউ চিনতে পারেনি কিন্তু আমি পেরেছিলুম।

ইন্দ্র। উঃ! কি সাহস! খুন ক'রে ছদ্মবেশে আবার তোমাদের বাড়ীর সামনে গিয়েছিল ?

অন্নদা। হ্যাঁ। পরে তাঁর মুখে শুনেছিলাম এ দুঃসাহসের কাজ তিনি নাকি আমার জন্যেই করেছিলেন। তারপর একদিন গভীর রাত্রে খিড়কীর দরজা খুলে, সকলের অলক্ষ্যে স্বেচ্ছায়, আমি আমার স্বামীর জন্য গৃহত্যাগ করলাম। সবাই শুনলো—সবাই জানলো—অন্নদা কুল ত্যাগ কোরেছে। তাই বোলছিলাম ভাই, কারুর কাছে যাবার আজ আমার মুখও নেই, উপায়ও নেই।

ইন্দ্র। আচ্ছা দিদি, তোমার বাবা কি আজও বেঁচে আছেন ?

অন্নদা। জানি না বেঁচে আছেন কিনা, আর বেঁচে থাকলেও তাঁর কাছে ফিরে যাওয়া এখন আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, স্বামী যতদিন বেঁচে ছিলেন তখন যখন বাবার কাছে আত্মপ্রকাশ করতে পারিনি তখন—

শ্রীকান্ত। কিন্তু আজ আর তো সে ভয় নেই দিদি—শাহজী তো বেঁচে নেই, আজ তো তুমি ফিরে যেতে পার।

অন্নদা। না শ্রীকান্ত তাও আজ আর হয় না।

শ্রীকান্ত। আচ্ছা দিদি, সবই তো বললে, কিন্তু শাহজীর আসল নামটা যে কি ছিল তাতো বললে না।

অন্নদা। বোকা ছেলে! স্বামীর নাম কি মুখে আনতে পারি ভাই।

ইন্দ্র। শাহজী লেখাপড়া জানতেন ?

অন্নদা। হ্যাঁ জানতেন বৈকি। আমার বাবাই তাঁকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। আমাদের ভাই ছিল না, আমরা দুটি মাত্র বোন। তাই বাবা গরীবের ছেলে দেখে, নিজের কাছে রেখে, লেখাপড়া শিখিয়ে তাঁদের সঙ্গে আমাদের বিয়ে দেন। যাক্, এইবার কবরে ফুল ক-টা দিয়ে আমি বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু এত দুঃখের মাঝেও

এই কচি বুক দু'খানি যে আমার বুকে পুরে নিয়ে যেতে পারলাম! তাতে যে আমার কি শান্তি! কি তৃপ্তি! তা তোমাদের বুঝিয়ে বোলতে পারবো না ভাই।

ইন্দ্র। তোমার সব কথা শোনার পর আর যে কিছুতেই তোমায় ছেড়ে দিতে মন চাইছে না দিদি।

অন্নদা। আমার কথা ভেবে তোমরা মন খারাপ কোরো না ভাই। এইটুকুই শুধু মনে কোরো, তোমাদের দিদি যেখানেই থাক্, ভালই থাকবে। কেন না দুঃখ সয়ে সয়েই এখন আর কোন দুঃখই তোমাদের দিদির গায়ে লাগে না।

(ধীরে ধীরে ইন্দ্রনাথ আর শ্রীকান্তকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন)

অন্নদা। মায়ের পেটের ভাই ছিল না। ভাইয়ের স্নেহ-ভালবাসা যে কি জিনিস, অতি বড় দুঃখের দিনে তা যখন জানলাম, তখন আমি একুল ওকুল দুকুলই হারিয়ে বসে আছি! কি বলে তোদের আশীর্ব্বাদ কোরবো ভেবে পাচ্ছি না। যাবার সময় শুধু এইটুকু বলে যাই, ভগবান যদি এই পতিব্রতার মুখ রাখেন, তাহলে তোদের বন্ধুত্বটাও যেন তিনি অক্ষয় করেন। (অন্নদা ধীরে ধীরে ফুলগুলি লইয়া আঙ্গিনার বাহির হইবার উদ্যোগ করিল। তখন শ্রীকান্তর চোখে জল! ইন্দ্রনাথ ব্যাকুলভাবে ডাকিল।)

ইন্দ্র। দিদি।

(অন্নদা দূর হইতে কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন)

অন্নদা। ছিঃ ভাই, যাবার সময় পিছু ডাকতে নেই—(শ্রীকান্ত টাকাগুলি দেখাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—)

শ্রীকান্ত। কিন্তু—যাবার সময় এ টাকা কটাও কি নিয়ে যেতে নেই?

অন্নদা। ওরে, তোর ঐ টাকা-কটার সঙ্গে যে মায়া জড়ান রয়েছে। সাপুড়ের সঙ্গ নিয়ে যখন বাপের ঘর ছেড়েছিলাম তখন আর পেছন ফিরে চাই নি। আজ তোদের ছেড়ে আবার যখন পথে পাড়ি দিচ্ছি—তখন আর টাকার দিকে ফিরে চাইতে পারব না ভাই, ফিরে চাইতে পারব না। [প্রস্থান

(ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত পাথরের মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কুটীরের অদূরে অস্পষ্ট কবরের ঢিবি দেখা যাইতেছিল সেখানে অন্নদার ছায়ামূর্ত্তি প্রকাশ পাইল। দেখা গেল, অন্নদা তখন কবরের ওপর ফুল দিতেছে।)

শ্রীকান্ত। সতী-সাবিত্রীর দেশে, স্বামীর জন্যে তুমি যে দুঃখ সইলে দিদি! তা কখনই ভুলবো না—

ইন্দ্র। ওরে শ্রীকান্ত আয়! এখান থেকে আমরা দিদিকে প্রণাম করি। দিদিকে যারা কুলত্যাগিণী বলে জানে, ইচ্ছে করছে একবার তাদের উদ্দেশ্যে বলি—ওগো! তোমরা যাকে কুলত্যাগিণী বলে জান, সকাল-বেলায় ঐ কুলত্যাগিনীর নামটা একবার মুখে এনো, তাহলে অনেক দুষ্কৃতির হাত থেকে তোমরা এড়াতে পারবে।

(দেখা গেল ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত হাঁটু গাড়িয়া অন্নদার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেছে।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কুমার বাহাদুরের ক্যাম্প

কুমার বাহাদুর শিকার করিতে আসিয়া বনের মধ্যে তাঁবু গাড়িয়াছেন। তখন রাত্রি প্রায় ৯টা। কুমার বাহাদুর সপারিষদ আসর জাঁকাইয়া বসিয়া আছেন। পাটনা হইতে পিয়ারী বাইজী কুমার বাহাদুরের শিকার পার্টিতে আনন্দ-বিধান করিবার জন্য আসিয়াছে। সঙ্গে সান্ত্বনা নামে অপর একজন বাইজীও আসিয়াছে, পিয়ারী বাইজী গাহিতেছিল ও তাহার সহিত সান্ত্বনা বাইজী ধুয়া ধরিতেছিল। তবলচী সঙ্গত করিতেছিল। কুমার বাহাদুর ও পারিষদবর্গ মধ্যে মধ্যে মদ্যপান করিতেছিলেন ও গানের তারিফ করিতেছিলেন।

আও ম্যান, ব্যহলায়েঁ সাজ্যন
আও ম্যন ব্যহলায়েঁ।
(তুন্) ম্যন বীণা কো ছেড়ো
হম্ রাগ ম্যানোহর গায়েঁ।
অ্যপনে ম্যন কা সুন্দর বাগ
হরা ভ্যরা হয় আওর বেদাগ
আশাওঁকে ফুল চুণী ম্যয়
কাঁটোঁমে কেঁও যায়েঁ।
ফুলোঁপ্যর ভী ম্যস্তী ছায়ী
ক্যলিওঁ নে ভী লী অ্যঙ্গড়ায়ী
ঝুম্ ঝুম্ কে ম্যস্ত হওয়ায়েঁ
হমসে ক্যহতী যায়েঁ।

আসর যখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে ইহারই মাঝে শ্রীকান্তকে প্রবেশ করিতে দেখা যায়। কুমার বাহাদুর তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বলেন—

কুমার। এই যে শ্রীকান্ত! এস এস। তোমার কথাই এতক্ষণ ভাবছিলুম। (শ্রীকান্ত আসরের একদিকে বসিতে যাইতেছিল কুমার বাহাদুর বাধা দিয়া নিজের কাছে আসন নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—) না-না-না, ওদিকে নয়, এই আমার কাছে এসে বস, তুমি কাছে না বস্‌লে কি জমে (বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন)—এই শ্রীকান্ত, আমার বাল্যবন্ধু, খুব ভাল শিকারী। শিকার লক্ষ্য করে বন্দুকের ঘোড়া টিপ্‌লে, সে শিকার আর ফস্‌কায় না।

শ্রীকান্ত। কুমার বাহাদুর! বন্ধুর শিকারের প্রশংসায় তো পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠলেন কিন্তু এখানে যাঁরা আছেন, বাইজীর এমন গান ছেড়ে নিশ্চয়ই তাঁরা আমার প্রশংসা শুনতে চান না।

(ইয়ার-বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন জড়িতকণ্ঠে বলিলেন)

ইয়ার-বন্ধু। ঠিক-ঠিক, ঠিক বলছেন শ্রীকান্তবাবু। কি বাইজী? থামলে কেন? চলুক।

(পিয়ারী বাইজী এতক্ষণ শ্রীকান্তর মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। ইয়ার-বন্ধুদের কথায় তাহার যেন চমক ভাঙিল)

পিয়ারী। আর না। অনেক গান তো আজ হ'ল।

জনৈক পার্ষদ। তা বললে কি হয় বাইজী! তোমার অমন গান, শ্রীকান্তবাবু শুনতে না পেলে, তাঁর একটা আপশোষ থেকে যাবে যে—

পার্ষদবর্গ। ঠিক ঠিক—

কুমার। হোক বাইজী, এত ক'রে সবাই যখন বোলছে—তখন হোক আর একটা। কিহে শ্রীকান্ত, কি গান হবে?

শ্রীকান্ত। আমি বলব? বেশ তাহলে এবার একটা বাঙলা গানই হোক—

মনোহর সাজে এলে মনোরম শ্যাম
তোমারে দিলাম প্রীতি প্রাণের প্রণাম।
(প্রিয়) গানের প্রণাম॥
চরণে পরাণ বাঁধা
জানে তা দুখিনী রাধা
তুমি দিলে প্রেমাগুণ আমি জ্বলিলাম!
কিছু শুনি, কিছু বল, কিছু সোহাগের কথা—
তোমারে যে দিত ফুল আমি সেই বনলতা।
কালোতে দেখেছি আলো
পারি কি না বেসে ভালো
কালামুখী বলে লোকে কলঙ্কিনী মোর নাম।

পিয়ারী বাইজী গান ধরিল। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অনেকে 'বাঃ! বেশ বহুত আচ্ছা', প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া আসর জাঁকাইয়া তুলিল। ইতিমধ্যে সান্ত্বনা বাইজী পিয়ারীর মুখের তান কাড়িয়া লইয়া গান গাহিতে লাগিল—গীতান্তে শ্রীকান্ত 'বাঃ বাঃ!' বলিয়া উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মী মুখ টিপিয়া হাসিল।

(কুমার বাহাদুর বলিলেন—)

কুমার। তুমি যখন এসে পড়েছ, তখন কাল সকালে গ্রামের ও পাড়ে বালির চড়ায় তাহলে শিকারে যাওয়া যাবে? কি বল শ্রীকান্ত?

জনৈক পার্ষদ। হাঁ হাঁ, ও চড়ায় নানা রকমের পাখী পাওয়া যায়—

শ্রীকান্ত। পাখী?

শ্রীকৃষ্ণবাবু। জি হাঁ, বহুত আচ্ছি চিড়িয়া।

শ্রীকান্ত। মাফ কর কুমার বাহাদুর! আমি ও পাখীটাখী শিকার কোরতে পারবো না। গোঁফ ওঠার পর থেকে ছর্‌রা দেওয়া বন্দুক আর কোনদিন আমি ছুঁড়িনি।

কুমার। বল কি! (হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—)

শ্রীকৃষ্ণবাবু। চিড়িয়া শিকারমে কুছ্ সরম্ হ্যায়?

শ্রীকান্ত। সব কোইকো নেহি, লেকেন হামে হ্যায়।

অপর একজন পার্ষদ। ও! তুমি বুঝি বাঘ ছাড়া আর কিছু শিকার কর না?

শ্রীকান্ত। বাঘ বলে কোন কথা নেই, এমন জন্তু আমি শিকার করি যা হিংস্র। নিরীহ পশু-পক্ষীকে লক্ষ্য করে আমি আর বন্দুক ছুঁড়ি না।

(শ্রীকৃষ্ণবাবু শ্রীকান্তের কথাবার্ত্তা শুনিয়া শ্লেষ করিয়া কহিলেন—)

শ্রীকৃষ্ণবাবু। আরে রাখ-রাখ। বাঙালী বাবু সব কেমন বীর আছে উ হামি খুব জানে। অন্ধকারে রাস্তা চল্‌বে তো পাঁচ পাঁচ আদমী, লাঠি আওর পাঁচ পাঁচ লাল্‌টেন যে সঙ্গে রাখে, উ দিখাবে বীর্‌তা! আচ্ছা, আজ শনিবার অওর অমাওয়াশ আছে। ভালা, যাও তো আজ রাতে ঐ মহা-সোশানে, তব্ জানি বীর্‌তা।

শ্রীকান্ত। প্রয়োজন হ'লে সে সাহস এবং বীরত্ব আমি নিশ্চয়ই দেখাতে পারি।

শ্রীকৃষ্ণবাবু। ব্যাস্-ব্যাস্ চুপ রহো, মুখে বড়ায়ী সোকলেই করে, আওর কাজের সময় দেখো তো দাঁত মে দাঁত লাগকে অজ্ঞান হোয়ে যায়। ইয়ে কোই সাধারণ সোশান নেই—মহা-সোশান আছে। এখানে হাজার হাজার নরমুণ্ড লোটলোট হোতে থাকে। দেবী ভয়রবী আপন সব চেলাদেরকে সাথ লিয়ে নাচ্-নাচকে নরমুণ্ডকা গেণ্ডুয়া খেলে, জানো?

শ্রীকান্ত। আমি ও সব বিশ্বাস করি না—

শ্রীকৃষ্ণবাবু। বিশ্‌ওয়াস নেই! আরে তোমার মোতো কেতো অবিশওয়াসী বাঙালী, আংরেজ, জজ, মেজিষ্টর—আপন প্রাণ বাঁচায়ে ভেগে এলো, অর্ তুমি তো বাচ্চা আছে!

শ্রীকান্ত। আমি বাচ্চাই হই আর যাই হই, মোট কথা ভূতপ্রেত আমি বিশ্বাস করি না, আর যাঁরা বলেন, ভূতপ্রেত চোখে দেখেছেন হয় তাঁরা ঠকেছেন, নয় তারা মিথ্যাবাদী—

শ্রীকৃষ্ণবাবু। মিথ্যেয়াবাদী? অয় বাপ্! জানো, এই গেরামে দু'একজন সিদ্ধ-সাধু আছেন, উওলোগ আপন আঁখেসে দেখা। অওর তুম্ কহো মিথ্যেয়াবাদী? বহুৎ আচ্ছা, তোমার হিম্মৎ হোয় তো যাও আজ রাতে ঐ সোশানে।

শ্রীকান্ত। যাব—নিশ্চয়ই যাব।

শ্রীকৃষ্ণবাবু। যাওগে? ভালো কোথা। লেকিন, প্রাণ যেথোন যাবে?

শ্রীকান্ত। না বাবুজী না—তোমাকে দোষ দেওয়া হবে না। তোমার ভয় নেই। কিন্তু অজানা অচেনা জায়গায় আমি তো শুধুহাতে যাব না, একটা বন্দুক নিয়ে যাব।

শ্রীকৃষ্ণবাবু। একটা কেন? তুমি দুটো বন্দুক লিও।

শ্রীকান্ত। না, দুটো-দশটার দরকার নেই, ও একটাই যথেষ্ট।

(পিয়ারী ধীরে ধীরে শ্রীকান্তকে বলিল)

পিয়ারী। এত দুঃসাহস কি ভাল?

শ্রীকান্ত। মন্দই বা কি? যদি অক্ষত-দেহে আর নির্ভিকচিত্তে ওখান থেকে ফিরে আসতে পারি, তা হ'লেই তো মহা-শ্মশানের মহিমা-কীর্ত্তন ক্রমশই ক'মে আসবে।

পিয়ারী। যা ভাল বোঝেন, তাই করুন। (কুমারের প্রতি) কুমার বাহাদুর আজকের আসর থেকে আমি ছুটি চাইছি।

কুমার বাহাদুর। আচ্ছা আচ্ছা।

(বাইজী যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কুমার বাহাদুরকে সেলাম জানাইয়া বলিল)—

পিয়ারী। সেলাম কুমার বাহাদুর !

(কুমার প্রত্যভিবাদন করিলেন, বাইজী অন্যান্যদিগের প্রতি-সেলাম জানাইল এবং শ্রীকান্তর নিকট আসিয়া কেবল মাত্র বলিল—'প্রণাম।' দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া শ্রীকান্তকে প্রণাম করিল। শ্রীকান্ত দুই হাত তুলিয়া প্রত্যভিবাদন করিল—পিয়ারী বাহির হইয়া গেল।)

অন্য একটি পার্ষদ। দিলে আজকের আসরটা মাটি করে! ভূতের গল্প আর চিড়িয়া শিকার এই দুটোয় মিলিয়ে সব মাটি ক'রে দিলে !

শ্রীকান্ত। যা বলেছেন, মনে হচ্ছে আমি আসার আগে পর্য্যন্ত আসরটা বেশ ভালই চল্‌ছিল। আমি এসেই বোধহয় সব পণ্ড করে দিলাম, কি বলেন ?

কুমার। না-না সেকি শ্রীকান্ত ? তুমি এলে বলেই তো আসরটা আজ বেশী করে জমে উঠ্‌ল। কাল যদি আবার শ্মশান থেকে ফিরে আসতে পার, তা'হলে আসরটা এবার শুধু জম্‌বে না—একেবারে বরফ হ'য়ে যাবে। (সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল)।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পিয়ারী বাইজীর তাঁবু

তাঁবুর ভিতর কোন মানুষ নাই। খান-দুই চেয়ার। তাঁবুর মধ্যস্থলে একটি টেবিলের উপর টেবিল ল্যাম্প জ্বলিতেছে। সহসা পিয়ারী বাইজী ব্যস্তভাবে তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিল :

পিয়ারী। রতন! ও রতন!

রতন। (নেপথ্যে) আজ্ঞে যাই মা। (রতন প্রবেশ করিল।)

পিয়ারী। ছাখ্ রতন! কুমার বাহাদুরের বন্ধুদের তাঁবুতে শ্রীকান্ত-বাবু বলে এক বাঙালী ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁকে এখুনই একবার এখানে ডেকে নিয়ে আয় ত—

রতন। যে আজ্ঞে। (প্রস্থান। রতনের সঙ্গে কথার মাঝে অপর এক বাইজীকে প্রবেশ করিতে দেখা যায়, পিয়ারী তাহা টের পায় না। রতন চলিয়া গেলে সে বলিল—)

অন্য বাইজী। কি ব্যাপার বলতো পিয়ারী? এই রাতে বাঙালী ভদ্রলোকটিকে ডেকে পাঠালে?

পিয়ারী। ডেকে পাঠালাম ভদ্রলোককে ভাল লেগেছে। তাই—

অন্য বাইজী। কিন্তু পয়সা খাচ্ছ কুমার বাহাদুরের, আর ভাল লাগলো ঐ মোসাহেবটাকে?

পিয়ারী। হ্যাঁ। বাইজীদের কাণ্ডই আলাদা! যাক্, আমার একটু দেরী আছে। তুমি ততক্ষণ খেয়ে নাও গে, রাত হ'য়েছে।

অন্য বাইজী। হ্যাঁ তাই যাই। (চলিয়া গেল। পিয়ারী পিঠের এলো-চুলগুলি হাত দিয়া নাড়িতে লাগিল। ইহারই মাঝে রতন শ্রীকান্তকে লইয়া তাঁবুতে প্রবেশ করে ও ডাকে)

রতন। মা! (পিয়ারী ফিরিয়া দেখে রতনের সহিত শ্রীকান্তকে, পিয়ারী সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বলে)

পিয়ারী। এই যে আসুন—(রতন ইত্যবসরে চলিয়া যায়। পিয়ারী একটি চেয়ার আগাইয়া দিয়া বলে)—ও কি! দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ব'সো। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, ভগবান যে কখন কার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেন তা কেউ বলতে পারে না। তা যাক্—বাবা ভাল আছেন তো?

(পিয়ারীর প্রশ্নে শ্রীকান্ত আরও বিস্মিত হয় ও কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলে)

শ্রীকান্ত। বাবা মারা গেছেন। (পিয়ারী সবিস্ময়ে বলে)

পিয়ারী। মারা গেছেন! মা—

শ্রীকান্ত। মা আগেই মারা গেছেন।

পিয়ারী। ওঃ! তাইতো বলি। যাক্ এখন—আছ কোথায়? পিসিমার কাছেই আছ তো?

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ। নইলে আর থাকবো কোথায়? কিন্তু আমার সম্বন্ধে এত কথা জিজ্ঞাসা করে তোমার লাভ কি?

পিয়ারী। লাভ! লাভ কিছুই নয়, লাভ-ক্ষতিই কি সংসারের সব? মায়া, মমতা, ভালবাসা এগুলো কি কিছুই নয়? বিয়ে-থাও করনি বোধ হয়?

শ্রীকান্ত। না। আচ্ছা, তুমি কে বলো তো? তুমি যে এত কথা আমায় জিজ্ঞাসা কোরছ—তোমাকে কখনও দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।

পিয়ারী। আমার নাম যে পিয়ারী, তা তো তুমি আগেই শুনেছ; কিন্তু মুখ দেখেও যখন আমাকে চিন্‌তে পারলে না, তখন আমার ছেলেবেলার ডাক-নাম শুনলেই কি চিনতে পারবে?

শ্রীকান্ত। তা না হয় না পারলাম। কিন্তু তুমি আমায় চিন্‌লে কি ক'রে ?

পিয়ারী। তোমাকে চিনেছিলাম ঠাকুর, দুর্বুদ্ধির তাড়ায়। তুমি আমার যত চোখের জল ফেলিয়েছিলে ভাগ্যিস সূর্য্যদেব তা শুকিয়ে নিয়েছেন, নইলে চোখের জলের একটা পুকুর হ'য়ে থাকত। তা যাক— কুমার বাহাদুরের তাঁবুতে তোমাকে দেখে আমি অবাক হ'য়ে গেছি! বলি, মোসাহেবী ব্যবসাটা ধরা হলো কেন ?

শ্রীকান্ত। যে ক'দিন চাকরী না জোটে, সে কদিন না হয় একটু মোসাহেবীই কোরলাম। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) বাইরের লোকজনেরা হয়তো কিছু মনে করবে। আমি চলি—

পিয়ারী। যদি কিছু মনে করে, সে তো তোমার সৌভাগ্য ঠাকুর!

(কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিয়ারী হাসিয়া উঠিল—শ্রীকান্ত চলিয়া যাইতেছিল, পিয়ারী বাধা দিয়া বলিল)

পিয়ারী। কি ? এর মধ্যে চল্‌লে যে ? আমার আসল কথাটাই ত তোমার বলা হয়নি। ও শ্মশানে-টশানে আজ তোমার যাওয়া হবে না—কোনমতেই না।

শ্রীকান্ত। (আশ্চর্য্যভাবে) কেন ?

পিয়ারী। কেন আবার কি ? ভূত-প্রেত কি নেই ? বলি- প্রাণের মায়া কি তুমি কোনকালেই কোরতে জান না ?

শ্রীকান্ত। না, হাজার হোক আমি ইন্দ্রনাথের চেলা তো—

পিয়ারী। যার চেলাই তুমি হও না কেন ? তোমাকে আমি কিছুতেই যেতে দেবো না। আর যদি একান্তই যাও, তাহ'লে আমিও তোমার সঙ্গ নেবো।

শ্রীকান্ত। বেশ, তাই না হয় নিও।

পিয়ারী। আহা! কি কথাই বল্‌লে লোকে বলবে, বাবু শিকারে

এসে, একটা বাইউলি সঙ্গে ক'রে, রাত-দুপুরে ভূত দেখতে গিয়েছিলেন। তুমি যে এত অধঃপাতে নেমে যেতে পারো, কেউ তা কোনদিন ভাবিনি।

শ্রীকান্ত। লোকের ভাবাভাবির যে কত দাম, সে তো তুমি নিজে বেশ ভালভাবেই জান। তুমিই যে এমন অধঃপাতে যাবে, সেই বা ক'জনা ভেবেছিল ?

পিয়ারী। সত্যি! কিন্তু কে আমি বলতো দেখি ?

শ্রীকান্ত। তুমি পিয়ারী।

পিয়ারী। সে তো সবাই জানে।

শ্রীকান্ত। সবাই যা জানে না, আমি তা জানি, একথা শুনলেই কি তুমি খুসী হবে ? (পিয়ারী নিরুত্তর) তা যাক্—আমি চললুম।

(পিয়ারী পথ আগলাইয়া)

পিয়ারী। যদি যেতে না দিই। তুমি কি জোর ক'রে যাবে ?

শ্রীকান্ত। কিন্তু যেতেই বা দেবে না কেন ?

পিয়ারী। দেবোই বা কেন ? সত্যিকারের ভূত কি নেই যে তুমি যাবে বললেই যেতে দেবো ?

শ্রীকান্ত। সত্যিকারের ভূত আছে কিনা জানি না, কিন্তু মিথ্যা ভূত যে আছে, তা আমি জানি। তারা সমুখে দাঁড়িয়ে কথা কয়, কাঁদে, পথ আগলায়, আবার দরকার হ'লে তারা ঘাড় মট্‌কেও খায়।

পিয়ারী। আমাকে তা হ'লে তুমি চিনেছো বল ? কিন্তু ওটা তোমার ভুল। তারা অনেক কীর্ত্তিই করে সত্যি, কিন্তু ঘাড় মট্‌কাবার জন্যে পথ আগলায় না। তাদেরও আপন-পর বোধ আছে।

শ্রীকান্ত। এতো তোমার নিজের কথা। কিন্তু তুমি কি ভূত ?

পিয়ারী। ভূত বৈকি, যারা ম'রে গিয়েও মরে না, তারাই ভূত। এক হিসেবে আমি যে মরে গিয়েছি, তা সত্যি। কিন্তু সত্যি হোক,

মিথ্যে হোক, নিজের মরণ আমি নিজে রটাইনি। গ্রামে এসে মামাকে দিয়ে মা রটিয়েছিলেন—কাশীতে ওলাওঠায় আমি মরেছি।

শ্রীকান্ত। (সবিস্ময়ে) তুমি কি! তুমি কি—

পিয়ারী। আমি রাজলক্ষ্মী—

শ্রীকান্ত। হুঁ। তোমার কথা বলার ধরণ দেখে অনেকক্ষণ থেকে আমি এই সন্দেহই কোরছিলাম যে তুমি রাজলক্ষ্মী। কিন্তু পিয়ারী হ'লে কবে?

পিয়ারী। তা অনেকদিন হ'লো।

শ্রীকান্ত। তোমার স্বামীর খবর কি?

পিয়ারী। বোল্‌তে পারি না। আমাদের জাতকুল বজায় করার জন্যে নারায়ণ সাক্ষী রেখে আমাদের দু-বোনকে একসঙ্গে বিয়ে করে ৭০৲ টাকা ট্যাঁকে গুঁজে, দুটো ফুল ফেলে দিয়ে, সেই যে তিনি উধাও হয়েছেন, তার পর আর তাঁর কোন খবরই আমরা জানিঁ না।

শ্রীকান্ত। তোমার দিদি সুরলক্ষ্মী আর তোমার বিয়ের কথা মনে হ'লে, সত্যিই দুঃখ হয়, ওটা তো বিয়েই নয়। ওটা শুধু অন্ধ সমাজের চোখে ধুলো দেওয়া মাত্র। নইলে বাঁকুড়ো জেলার সেই রাঁধুনে-বামুন দু'বার দু'টো পিঁড়িতে বসে তোমাদের দু-বোনের উদ্দেশ্যে দু'টো ফুল ফেলে দিলে বৈ ত নয়?

পিয়ারী। আমাদের জাতকুল বজায় রাখতে তাই বা দেয় কে?

শ্রীকান্ত। ওঃ! কী জাতকুলই বজায় কোরেছ? তাই রাজলক্ষ্মী ম'রে গিয়ে, আজ পিয়ারী বাইজীর আবির্ভাব হ'য়েছে। তোমাদের বর দেখে আর বিয়ের ব্যবস্থা দেখে, সত্যিই রাজলক্ষ্মী সেদিন আর আমি চোখের জল রাখতে পারিনি।

পিয়ারী। যাকে ভালবাসা যায়, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দুঃখ তো তারই

জন্যে বেশী ক'রে দেখা দেয়। আর সেইজন্যেই তুমি শ্মশানে যাবে শুনে রতনকে দিয়ে তোমায় ডেকে পাঠালাম।

শ্রীকান্ত। তুমি কি আমায় ভাল—

পিয়ারী। বাসি বৈকি? আজ নয়, মনসা পণ্ডিতের পাঠশালায় তুমি যেদিন সর্দ্দার পোড়ো ছিলে—সেইদিন থেকেই। তুমি কি মনে করো, রোজ কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে বঁইচির মালা গেঁথে দিতুম, সেকি তোমার মারের ভয়ে? মোটেই না। সে মেয়ে রাজলক্ষ্মী নয়। তোমাকে ভালবেসেছিলাম বলে, বঁইচির ফল তুলতে কাঁটাকে আমি ভয় করিনি। কিন্তু আমি ভাবছি, তুমি কি? মনের কোণে এতটুকুও আমায় স্থান দাওনি?

শ্রীকান্ত। তোমাকে মনে ক'রেছিলামই বা কবে যে, স্থান দেব? বরং আজ তোমাকে চিনতে পেরেছি দেখে, নিজেই আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছি। আচ্ছা, কথায় কথায় রাত অনেক হ'য়ে গেল—সারারাত আজ আবার শ্মশানে জেগে কাটাতে হবে। আমি চললাম।

পিয়ারী। তুমি যে ধাতের মানুষ তাতে তোমাকে যে আটকাতে পারবো না, সে আমি জানি। তবু ভেবেছিলাম, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলে ক'য়ে যদি তোমাকে নিরস্ত করতে পারি। আচ্ছা যাও। পেছু ডেকে আর অমঙ্গল কোরব না। কিন্তু এই বিদেশ-বিভুঁই-এ যদি একটা কিছু আপদ-বিপদ হয়, তাহলে তোমায় ফেলেও যেতে পারবো না। হাজার হোক্, আমাদের মেয়েমানুষের মন তো।

শ্রীকান্ত। বেশ তো বাইজী, আমার কেউ-কোথাও নেই, তবু তো জানতে পারব, এমন একজন আছে যে আমাকে ফেলে যেতে পারবে না।

পিয়ারী। একশ'বার বাইজী ব'লে যত অপমানই কর না কেন, রাজলক্ষ্মী তোমাকে যে ফেলে যেতে পারবে না—সেকথা তুমি মনে মনে বেশ ভালরকমই জান। তোমায় ফেলে যেতে পারলেই ভাল হ'তো।

কিন্তু মেয়েমানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তারা একবার যদি কাউকে ভালবেসেছে—তো মরেছে।

শ্রীকান্ত। (হাসিয়া) পিয়ারী! ভাল সন্ন্যাসীও অনেক সময় ভিক্ষে পায় না, কেন জান?

পিয়ারী। জানি, কিন্তু তোমার এ খোঁচায় এত ধার নেই যে, তুমি আমায় বেঁধো! এ আমার ঈশ্বর-দত্ত ধন। যখন সংসারের ভাল-মন্দ জ্ঞান পর্য্যন্ত হয়নি, আমার এ মূলধনটি তখনকার—আজকের নয়।

শ্রীকান্ত। বেশ, ভাল কথা—শ্মশানে গিয়ে যদি আমার কোন বিপদ হয় তাহ'লে তোমার ঈশ্বর-দত্ত ধনের সঙ্গে সঙ্গে যাচাই করার সুযোগ মিলে যাবে। আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তাই যেন হয়।

পিয়ারী। দুর্গা, দুর্গা! ছিঃ! অমন কথা মুখে এনো না। ভালোয় ভালোয় ফিরে এসো। এ সত্যি আর যাচাই ক'রে কাজ নেই।

(রাজলক্ষ্মী আঁচলটি গলায় জড়াইয়া শ্রীকান্তকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর মুখের উপর কিছুক্ষণ দৃষ্টিপাত করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। অশ্রুজড়িত কণ্ঠে রাজলক্ষ্মীর মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল)

পিয়ারী। দুর্গা, দুর্গা—

তৃতীয় দৃশ্য

শ্মশান

অন্ধকার গভীর রাত্রি। দূরে নদীর জল চিক্ চিক্ করিতেছে। নদীর তট বালুকা-বিস্তৃত। এই তটের উপর বহু নরমুণ্ড ও নরদেহের কঙ্কাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে। শিমুলগাছের ডালে বাদুড় ঝুলিতেছে। শকুনিরা পাখা ঝাপ্টাইতেছে। সমস্ত প্রান্তর ব্যাপিয়া একটা কাশের ঝোপ। অন্ধকারে এগুলিকে এক একটা মানুষ বলিয়া ভ্রম হয়। ইহারই মাঝে শ্রীকান্ত বন্দুক হাতে মহা-শ্মশানে প্রবেশ করে। সে ধীরে ধীরে শ্মশানের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। কয়েকটি নরমুণ্ড ও কঙ্কাল বন্দুকের কুঁদা দিয়া সরাইয়া দেয়। হঠাৎ একটা নিশাচর পাখী 'বাপ্ বাপ্' রবে চীৎকার করিতে থাকে। সে থমকিয়া দাঁড়ায় ও বন্দুকটি খুলিয়া টোটাটা আর একবার পরীক্ষা করে। সহসা শিশুর ক্রন্দন শোনা যায়। সে গাছের দিকে চাহিয়া দেখে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শিশুর ক্রন্দন থামিয়া যায়। পরে শ্রীকান্ত ধীরে ধীরে মাটির ঢিবির উপর গিয়া উপবেশন করে। হঠাৎ শোঁ শোঁ রবে বাতাস বহিতে থাকে। শ্রীকান্তর মনে হয়, কে যেন তাহার কানের পাশ দিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতেছে। ইতিমধ্যে দূর হইতে কয়েকজন লোক সমস্বরে ডাকিল—'বাবুজী!' 'বাবুসাব!' শ্রীকান্ত চারি-দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। পুনরায় সমবেত-কণ্ঠে বলিতে শোনা গেল—'বাবুজী' গুলি ছুড়বেন না যেন!' নেপথ্য হইতে রতনকে বলিতে শোনা গেল—

রতন। বাবু! আপনি যেখানেই থাকুন, গুলি-টুলি ছুঁড়বেন না—

আমি রতন। (ইতিমধ্যে রতন ও অপর তিনজন লোককে গোটাদুই হ্যারিকেন ও লাঠিসোঁটা লইয়া প্রবেশ করিতে দেখা গেল। রতনের তিনজন সঙ্গীর মধ্যে একজন ছট্টুলাল, সে তবলা বাজায়। একজন পিয়ারীর দারোয়ান ও একজন গ্রামের চৌকিদার। সকলকেই বেশ উদ্বিগ্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল। রতন হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল)

রতন। চলুন বাবু, রাত যে তিনটে বেজে গেল!

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ, এই যাব।

রতন। ধন্যি আপনার সাহস! আমরা চারজনে যে কত ভয়ে ভয়ে এসেছি বাবু, তা বোঝাতে পারি না।

শ্রীকান্ত। এলে কেন?

রতন। এলাম কি আর সাধে? টাকার লোভে। আমরা সবাই এক এক মাসের মাইনে পেয়ে গেছি যে!

শ্রীকান্ত। এক এক মাসের মাইনে পেয়ে গেছো?

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু! (গলা খাটো করিয়া) আপনি চলে আসার পর, মা'র সে কী কান্না বাবু! আমাকে চুপি চুপি ডেকে বললেন—রতন! কি হবে বাবা? তোরা না হয় একবার শ্মশানে যা। আমি তোদের এক এক মাসের মাইনে দিচ্ছি। মা'র কথা শুনে, ছোট্টুলাল আর গণেশকে ব'লে-ক'য়ে রাজী করালাম। কিন্তু আমরা এখানকার নতুন লোক, কেউ তো আর শ্মশানের পথ চিনি না। এমন সময় এই চৌকিদার হেঁকে যাচ্ছিল। মা বললেন—ওকে ডাক্—ওতো এই গ্রামেরই চৌকিদার। ওর সব পথঘাট জানা আছে। নিশ্চয়ই পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। মা'র কথায় বেরিয়ে গিয়ে চৌকিদারকে ডেকে নিয়ে এলুম।

শ্রীকান্ত। বল কি! আমার জন্তে তোমার মা এত কাণ্ড করেছেন?

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু।

(চৌকিদারকে দেখাইয়া)

এই চৌকিদারকেও মা অবশ্য ছ'টাকা বকশিস্ দিয়েছেন। মা ব'লেছিলেন, যাবার সময় একটিবার দেখা দিয়ে যেতে। চলুন বাবু, দেখা ক'রে যাবেন।

শ্রীকান্ত। না রতন, কাল যাবার আগে দেখা হবে, এখন নয়। আমার বড় ঘুম পেয়েছে, আমি চল্লুম।

(শ্রীকান্ত আর কোন কথা না বলিয়া ব্যস্তভাবে প্রস্থান করিল। রতন ও অন্যান্য সকলে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।)

চতুর্থ দৃশ্য

কুমার বাহাদুরের তাঁবু

(তখন সকাল ৭টা-৭॥০টা। সপার্ষদ কুমার বাহাদুর শ্রীকান্তর শ্মশানে যাওয়া সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন।)

শ্রীকৃষ্ণবাবু। (ঘাড় নাড়িয়া) উঁহু! এ কভি নেই হো স্যাকৃতা।

১ম পার্ষদ। আপনি তো বলেছেন, কভি নেই হো স্যাকৃতা, আর আমরা শুনে এলাম, সারারাত শ্মশানে কাটিয়ে সে এই ভোরবেলায় তাঁবুতে ফিরে এসেছে।

শ্রীকৃষ্ণবাবু। ঝুটি বাত, শ্রীকান্তবাবু মিথ্যা প্রচার কোরলো।

কুমার বাহাদুর। না না, সে নিজে রটায়নি। তার খোঁজে একজন বেয়ারাকে পাঠিয়েছিলাম। সে ও তাঁবুর দারোয়ানের কাছে শুনে এসেছে, শ্রীকান্ত সারারাত তাঁবুতে ছিল না।

শ্রীকৃষ্ণবাবু। লেকিন সেখানে গিয়েছিলো ইয়া কোথা গিয়েছিলো সো কওন জানে ?

কুমার বাহাদুর। না না, সে যে শ্মশানে গিয়েছিলো তারও প্রমাণ রয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণবাবু। ক্যায়সা প্রমাণ ?

কুমার বাহাদুর। এ গ্রামের এক চৌকিদার ভোর-রাত্রে তাকে শ্মশান থেকে ফিরে আস্‌তে দেখেছে যে !

২য় পার্ষদ। হ্যাঁ হ্যাঁ চৌকিদার যদি দেখে থাকে তাহলে—

শ্রীকৃষ্ণবাবু। লেকিন্ ইমন একটা হিম্মতের কাম কোরে শ্রীকান্তবাবু এতোক্ষণে হামাদের কাছে এসে সব প্রচার কেনো নাহি কোরলেন ?

(এই কথার মাঝে দেখা যায় শ্রীকান্ত তাঁবুতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহই তাহাকে লক্ষ্য করে নাই। শ্রীকৃষ্ণবাবুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীকান্ত বলে—)

শ্রীকান্ত। সাধারণ মানুষের ওপর বিচারের ভার দিয়ে বাঙালীর ছেলেরা কাজ কোরে যায় শ্রীকৃষ্ণবাবু ! নিজের পৌরুষ জাহির কোরে অপরের কাছে ছোট হওয়ার মত ছোট, বাঙালীর ছেলে নয়।

কুমার বাহাদুর। ঠিক্ ঠিক্ বলেছো শ্রীকান্ত। তোমার কথাই এতক্ষণ আমরা বলাবলি কোরছিলুম। কাল শ্মশানে গিয়েছিলে তো শুন্‌লাম—

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।

(ইতিমধ্যে পিয়ারী বাইজী অপর বাইজীটির সহিত তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া কুমার বাহাদুরকে অভিবাদন জানাইলে কুমার বাহাদুরও প্রত্যভিবাদন করিলেন। পিয়ারী শ্রীকান্তর পশ্চাতে উপবেশন করিল।)

কুমার। ধন্য সাহস তোমার শ্রীকান্ত ! তারপর কত রাত্রে সেখানে পৌঁছুলে ?

শ্রীকান্ত। রাত্তির ১২টা থেকে ১টার মধ্যে।

শ্রীকৃষ্ণবাবু। হ্যাঁ হ্যাঁ, কাল ১১॥৹টার পরে অমাওয়াশ লাগ্‌লো।

কুমার। ওঃ! কি ভয়ঙ্কর সাহস! শ্মশানের ভেতর ঢুক্‌লে? না বাইরে দাঁড়িয়েছিলে?

শ্রীকান্ত। শ্মশানের ভেতর শুধু ঢুকিনি—বসেও ছিলুম অনেকক্ষণ।

কুমার। তারপর, তারপর? বসে কি দেখলে?

শ্রীকান্ত। দেখলাম, ধূ ধূ করছে বালির চর।

কুমার। আর?

শ্রীকান্ত। কসাড় ঝোপ, আর শিমূলগাছ।

কুমার। আর?

শ্রীকান্ত। নদীর জল।

কুমার। আহা—এ সব তো জানি হে! বলি, সে সব কিছু দেখলে কি?

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ দেখলাম বৈকি! গোটাকতক বাদুড় আর শকুনি মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল।

শ্রীকৃষ্ণবাবু। আউর কুঁছ নেহি দেখা?

শ্রীকান্ত। না।

শ্রীকৃষ্ণবাবু। এ কেমন কোরে হোবে? তুম্ গ্যয়া নেহি।

শ্রীকান্ত। আপনি যদি তাই মনে করেন, তাহলে আপনার সে বিশ্বাসে আমি আঘাত দিতে চাইনে।

কুমার। (শ্রীকান্তর হাত দু'টি চাপিয়া ধরিয়া) সত্যি বল না ভাই শ্রীকান্ত কি দেখলে?

শ্রীকান্ত। সত্যি বলছি কুমার বাহাদুর, আমি কিচ্ছু দেখিনি।

কুমার। কতক্ষণ ছিলে সেখানে?

শ্রীকান্ত। তা ঘণ্টা-তিনেক হবে।

কুমার। আচ্ছা না দেখেছো না দেখেছো—কিছু শুনতেও কি পাওনি?

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ, তা পেয়েছি।

৩য় পার্ষদ। (আগ্রহে একটু আগাইয়া আসিয়া) কি শুনেছেন?

শ্রীকান্ত। শুনলাম, কতকগুলো নিশাচর পাখীর চীৎকার, আর বাচ্চা শকুনগুলো শিমূলগাছের ওপর ঠিক্ যেন কচি ছেলের মত কাঁদছে! তারপর, খানিকটা ঝড়ো হাওয়া বইল। কখনও বা মড়ার মাথাগুলো দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলো। সকলের শেষে, কে যেন আমার ডান কানের পাশে ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস ফেলছে অনুভব করলাম।

কুমার। ধন্যি সাহস তোমার শ্রীকান্ত, ধন্যি সাহস!

শ্রীকৃষ্ণবাবু। শ্রীকান্তবাবু, আপনি ইয়ার্থ ব্রাহ্মণ সন্তান আছেন। তভি আপনি প্রাণ লিয়ে ফিরে এলেন। ইয়ে কাম আওর কোই নাহি কর সেক্তা। লেকিন্ বাবুজী, হামার একটা কথা শুনেন, এমোন কাজ, আর কভি কোরবেন না। আপনার কে মায়ী-বাবার পুণ্যে ছিলো—তভি জান বেঁচে গেলো।

সকলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এমন কাজ আর কখনো করবেন না। (শ্রীকৃষ্ণবাবুর কথা শেষ হইলে দেখা গেল, শ্রীকান্ত আড় চোখে রাজলক্ষ্মীর দিকে চাহিয়া আছে। চোখাচোখি হইতেই শ্রীকান্ত চোখ ফিরাইয়া লইল। রাজলক্ষ্মী বলিল)

রাজলক্ষ্মী। কুমার বাহাদুর! এবার আমাকে বিদায় করার ব্যবস্থা করুন।

কুমার। তোমার সব ব্যবস্থাই তো কোরে দিয়েছি বাইজী! কর্ম্মচারীদের বলে দিয়েছি—তোমার মুজ্‌রোর টাকা সব মিটিয়ে দিতে, আর সেইসঙ্গে কিছু বখ্‌শিসেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আর, তোমার যাওয়ার গাড়ীটাড়ী ওরাই ব্যবস্থা ক'রে দেবে, বলা আছে।

পিয়ারী। যে আজ্ঞে। প্রয়োজনে মনে রাখবেন কিন্তু।

কুমার। হ্যাঁ হ্যাঁ, রাখবো বৈকি।

পিয়ারী। সেলাম।

(পিয়ারী ও অপর বাইজী প্রস্থানোদ্যত)

কুমার। তুমি কি আজই পাটনায় চলে যাবে?

পিয়ারী। (ফিরিয়া) আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ শেষ-রাত্রেই রওনা হব। আপনারাও তো দুএকদিনের মধ্যেই তাঁবু গুটোবেন?

কুমার। হ্যাঁ, কাল-পরশুর ভেতর আমরাও যাব।

পিয়ারী। আচ্ছা আসি তাহলে সেলাম!

(পিয়ারী ও তাহার সহচরী সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। শ্রীকান্ত বলিল)

শ্রীকান্ত। আমিও আজ বিদায় চাইছি—কুমার বাহাদুর!

কুমার। না না, সে কি কথা! তুমি কাল আমাদের সঙ্গে যাবে। গত কাল সারারাত শ্মশানে জেগে কাটিয়েছো। আজ কি তোমায় আমরা একলা ছেড়ে দিতে পারি?

শ্রীকৃষ্ণবাবু। ঠিক ঠিক, এয়সা কভি নেহি হো সেক্‌তা।

কুমার। যা বলেছেন শ্রীকৃষ্ণবাবু।

পঞ্চম দৃশ্য

পল্লীপথ

তখন শেষ রাত্রি। জনাকীর্ণ অন্ধকার পল্লীপথে পর পর দুইখানি গরুর গাড়ী যাইতে দেখা গেল, একখানি গাড়ী ছই দেওয়া অপরখানি খোলা। খোলা গাড়ীটার ওপর স্যুটকেশ, বিছানা, হারমোনিয়াম, তবলা প্রভৃতি দেখা যায়। গাড়ীর গাড়োয়ান উচ্চকণ্ঠে গান গাহিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়াছে। ইহারই মাঝে দেখা যায় শ্রীকান্ত প্রবেশ করে। গাড়ীর সহিত অনেক লোকজন দেখিয়া শ্রীকান্ত সম্মুখস্থ দীঘির এক শান বাঁধান ঘাটের চত্বরে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করে। গাড়ী দুইটি অদৃশ্য হইলে শ্রীকান্ত চত্বরের উপর বসিয়া পড়ে। ইতিমধ্যে নেপথ্য হইতে রতনের কণ্ঠ ভাসিয়া আসে।

রতন। কে ওখানে? শ্রীকান্তবাবু নাকি?

শ্রীকান্ত। কে রে?

রতন। আমি রতন।

শ্রীকান্ত। তোরা কি বাড়ী যাচ্ছিস?

রতন। হ্যাঁ বাবু, বাড়ী যাচ্ছি। আপনি একটু দাঁড়ান বাবু। মা আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

(গরুরগাড়ী দুইটি থামিল। রাজলক্ষ্মীর সহিত রতন দীঘির এপাড়ে আসিল)

রাজলক্ষ্মী। আমি ঠিক ধরেছি যে, এই রাত্রে তুমি ছাড়া আর কেউ এখানে বসে থাকতে পারে না। এত সাহস কারুর নেই। যাক্— আন্দাজে কিন্তু ঠিক ধরেছি! (হাসিতে লাগিল)

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ তা ধরেছো। কিন্তু এই শেষরাত্রে না বেরিয়ে, তোমরা দিনের গাড়ীতে গেলেই তো পারতে—

রাজলক্ষ্মী। তা পারতাম, কিন্তু পাটনায় গিয়ে পৌঁছতে রাত্তির হোত। ওরে রতন, তুই বরং গাড়ীর কাছে যা, জিনিস-পত্তর সব রয়েছে। (রতন চলিয়া গেল) একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

শ্রীকান্ত। নিশ্চয়ই পারো।

রাজলক্ষ্মী। কি জানি আমার সে অধিকার আছে কিনা ?

শ্রীকান্ত। আছে বৈ কি।

রাজলক্ষ্মী। তা যদি থাকে, তাহলে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, আজ আবার তুমি এখানে কেন এলে ?

শ্রীকান্ত। কেন এলাম তা আমি নিজেই জানি না।

রাজলক্ষ্মী। জান না ? আচ্ছা বেশ। কিন্তু লুকিয়ে এসেছিলে কেন ?

শ্রীকান্ত। এখানে আসার কথা কেউ জানে না বটে, কিন্তু লুকিয়ে আসিনি।

রাজলক্ষ্মী। তাহলে বোধ করি তুমি বল্‌তে চাও, তাঁবু থেকে কেউ তোমায় উড়িয়ে এনেছে ?

শ্রীকান্ত। না, কেউ উড়িয়ে আনেনি। নিজের পায়ে হেঁটে এসেছি সত্যি, কিন্তু কেন এলুম, কখন এলুম বোলতে পারি না। রাজলক্ষ্মী, তুমি বিশ্বাস কোরতে পারবে কিনা জানি না, কিন্তু ব্যাপারটা একটু আশ্চর্য্য। দুপুরবেলা ঘুমুবো বলে বিছানায় শুয়ে পড়লাম, তন্দ্রাও এলো, কিন্তু বার বার সে তন্দ্রা আমার ভেঙ্গে যেতে লাগলো।

রাজলক্ষ্মী। কেন ?

শ্রীকান্ত। আশা করেছিলাম, তুমি চলে যাওয়ার আগে রতনকে দিয়ে একবার অন্ততঃ আমাকে ডেকে পাঠাবে। সারাদিন গড়িয়ে

গেল। রতন এলো না। মনটা ভারী খারাপ হ'য়ে গেল। তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। সেই থেকে আর এই এতক্ষণ পর্য্য বনে, জঙ্গলে, শ্মশানে, বাঁধের ধারে, দীঘির পাড়ে এমনিভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

রাজলক্ষ্মী। ছি ছি! দেখ দেখি, কি ছেলেমানুষি! আর কারুর কাছে এ গল্প ক'রো না যেন, তাহলে তারা টিট্‌কারী দেবে। বল্‌বে—একটা বাইজীর জন্যে এত!

শ্রীকান্ত। বাইজীর জন্য নয়। মনটা উতলা হ'যে উঠল—রাজলক্ষ্মী জন্যে। যাক্—পূবে ফরসা হতে আরম্ভ করেছে, এবার আমি যাই।

রাজলক্ষ্মী। না, তোমার যাওয়া হবে না, আমার সঙ্গে তোমাকে এখুনিই যেতে হবে।

শ্রীকান্ত। তোমার সঙ্গে এখুনই এমনভাবে চলে যাওয়ার অর্থ কি হবে তা জান?

রাজলক্ষ্মী। জানি, সব জানি। কিন্তু এরা তো তোমার অভিভাবক নয় যে, মানের দায়ে প্রাণ দিতে হবে?

(শ্রীকান্তর হাত চাপিয়া ধরিযা)

কান্তদা! ঐ-রকম দুঃসাহসের কাজ করতে গিয়ে, হয়তো কোনদিন তুমি তোমার প্রাণটাই হারাবে। তোমার টিকিট কিনে দিচ্ছি, তুমি বাড়ী চলে যাও কিংবা যেখানে খুশি যাও। কিন্তু ওখানে আর একদণ্ডও নয়।

শ্রীকান্ত। কিন্তু ওখানে আমার কাপড়-চোপড় রয়েছে যে—

পিয়ারী। থাক্, তাঁদের ইচ্ছা হয়, তোমাকে পাঠিয়ে দেবেন। না হয় না দেবেন। তোমার প্রাণের চেয়ে তার দাম বেশি নয়।

শ্রীকান্ত। তার দাম বেশি নয় সত্যি, কিন্তু যে মিথ্যা-কুৎসা রটনা হবে তার দাম তো কম নয় লক্ষ্মী।

(রাজলক্ষ্মী নীরবে মাথা হেঁট করিয়া রহিল)

কী ? চুপ করে রইলে যে ?

পিযাবী। (ম্লান হাসিয়া) কি জান কান্তদা, যে কলমে সাবা জীবন জাল খত্ তৈরী কবেছি, সেই কলমটা দিয়েই আজ আর দানপত্র লিখতে হাত সরছে না। যাক্—কিন্তু কথা দাও, আজ বেলা ১২টাব আগেই এখান থেকে তুমি বেরিযে পড়বে ?

শ্রীকান্ত। আচ্ছা।

(পিযারী হাতের একটি আংটি খুলিযা শ্রীকান্তের পাযের কাছে রাখিযা গলবস্ত্রে প্রণাম কবিল। পরে পাযের ধূলা মাথায নিয়া আংটীটি শ্রীকান্তের পকেটে ফেলিযা দিযা বলিল।)

বাজলক্ষ্মী। বাড়ী ফিবে গিযে আমায চিঠি দেবে বল ?

শ্রীকান্ত। কিন্তু তোমাব ঠিকানা তো আমাব জানা নেই বাজলক্ষ্মী ?

পিযারী। রাজলক্ষ্মী নয, ঠিকানা—পিযাবী বাইজী, পাটনা। (পিযাবী যাইতে যাইতে ফিবিযা) হ্যা তোমাব কাছে আমার আব একটা প্রার্থনা—সুখেব দিনে না হোক, দুঃখের দিনে অন্ততঃ আমাকে একটু মনে বেখো।

শ্রীকান্ত। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিযা) বেশ।

(পিযারী ধীবে ধীবে চলিযা গেল। শ্রীকান্ত নিশ্চল হইযা দাঁড়াইযা রহিল। তখন সবেমাত্র পূবে ফরসা হইযাছে)

ষষ্ঠ দৃশ্য

পাটনার সন্নিকটস্থ বাড় গ্রাম

গ্রামের এক প্রান্তে একটি আমবাগানের মধ্যে এক সাধুর আস্তানা দেখা যায়। জটাজুটধারী এক সাধু, শিষ্য-সমভিব্যাহারে অর্দ্ধমুদ্রিত-চক্ষে বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে ধুনি জ্বলিতেছে। এই ধুনির উপর একটি বৃহদাকার লোটায় করিয়া চায়ের জল চাপান হইয়াছে। জনৈক বাচ্চা চেলা সাধু চা তৈরীর তদারক করিতেছে। তাহার অদূরে অপর একজন মধ্যবয়স্ক চেলা একটি বড় পাথরের বাটী দুই পায়ে ধরিয়া মস্তবড় একটি নিমদণ্ড দিয়া ভাঙ্ তৈয়ারী করিতেছে। চেলাদের মধ্যে অপর একজন গাঁজা প্রস্তুত করিতেছে। জনৈক চেলা ভজন গাহিতেছিল।

রাম ভ্যজ্যন সুখদায়ী গ্যন্থয়া
রাম ভ্যজ্যন সুখদায়ী।
ভ্যজ রাম, ভ্যজ রাম, ভ্যজ রাম॥
স্যচ্চে ম্যন সে ভ্যজ রাঘব কো
একদিন মুক্তি পায়ী!
রাম নাম হ্যয় অ্যমৃত ধারা—
রাম বিনা হ্যয় ক্যওন হ্যমারা
রাম নাম কা লেকে স্যহারা
বেক্যল্ ম্যন ক্যল পায়ী।
তুলসী কা যীওয্যন চ্যামকায়া
শ্যবরী কা ভী মান ব্যঢ়ায়া

দুখিওঁ কা স্তন্তাপ মিটায়া
দেত্য হুঁ তোর দুহায়ী।

যে চেলাটি গাঁজা প্রস্তুত করিতেছিল তাহা শেষ হইলে, সে একটি বৃহদাকার তাঁমা-বাঁধান কলিকায় গাঁজা ঢালিয়া কলিকাটি সাধু-বাবার হস্তে তুলিয়া দিল। পরে একটি সরু কাঠি ধুনির আগুনে জ্বালাইয়া কলিকাটি ধরাইয়া দিল। সাধুবাবা 'ব্যোম্ ব্যোম্' শব্দ করিয়া কলিকায় পর পর বার-কয়েক টান দিলেন। পরে যে চেলাটি সাধুর হাতে কলিকাটি তুলিয়া দিয়াছিল সাধুবাবা তাহারই হাতে উহা ফিরাইয়া দিলেন। চেলাটি কলিকায় কয়েকটি টান দিয়া অপর চেলার হাতে দিল। এইভাবে কলিকাটি চেলাদের মধ্যে ঘুরিতে লাগিল।

সাধু। ব্যোম্ ভোলেনাথ!

সকলে। ব্যোম্ ভোলেনাথ!

সাধু। সাধুরা গাঁজা খায় কেন জান?

সকলে। কেন বাবা?

সাধু। বাবা ভোলানাথের মত সব কিছু ভুলে থাকবার জন্যে। তাই বলছিলাম, মনই হচ্ছে আসল। মনকে স্থির কোরতে না পারলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব নয়। গাঁজা খাও, ভাঙ খাও, আর বাবা ভোলা-নাথের পাদ-পদ্মে মতি স্থির রাখ। তা হলেই ব্যাস, সব ঠিক হয়ে যাবে।

বাচ্চা সাধু। ব্যোম্ ভোলেনাথ!

সকলে। ব্যোম্ ভোলেনাথ!

সাধু। আমার নতুন চেলা কোথায় গেল?

১ম চেলা। সে গ্রামে ভিক্ষেয় বেরিয়েছে বাবা!

সাধু। (প্রথম চেলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন) কি রকম বুঝছ? ও পারবে?

১ম চেলা। হ্যাঁ বাবা, মনে তো হয় পারবে।

সাধু। হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। সংসার বৈরাগ্য না হ'লে কি আর এখানে ছুটে আসে? আমাকে এসেই সেদিন বলেছিল, বাবা! আমি গৃহত্যাগী মুক্তিপথের সন্ন্যাসী, হতভাগ্য শিশু! আমাকে দয়া করে আপনার চরণ-সেবার অধিকার দিন।

সকলে। আহা!

সাধু। বললাম, বাঙালী তুমি, বাঙলাদেশ ছেড়ে এখানে ছুটে এসেছ কেন? ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। এ অতি দুর্গম পথ।

২য় চেলা। আহা! তা আবার নয়।

সাধু। কিন্তু সে শুনলো না—আমার পা ধরে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো—বাবা, মহাভারতে লেখা আছে, মহাপাপিষ্ঠ জগাই মাধাই বশিষ্ঠ মুনির পা ধরে স্বর্গে গিয়েছিলেন। আর আপনার কৃপা হলে, আমি কি মুক্তি পাব না বাবা?

২য় চেলা। বড্ড খাঁটি কথা সেদিন ও বলেছিল বাবা!

সাধু। সেইজন্যেই তো ওকে আর ফেরাতে পারলাম না।

বাচ্চা সাধু। ফেরালেই ভাল করতেন বাবা।

সাধু। কেন? কেন?

বাচ্চা সাধু। ও এসেই যে-রকম আরম্ভ করেছে, তাতে আমাদের সকলকে না ডোবায়?

সাধু। কেন? এমন কথা কেন?

বাচ্চা সাধু। এই গ্রামের আশেপাশে ভয়ানক বসন্ত দেখা দিয়েছে—আর ও সেইসব রোগীর সেবা ক'রে বেড়াচ্ছে।

সাধু। কৈ? আমি তো কিছুই শুনিনি।

২য় চেলা। আপনি ধ্যানস্থ থাকেন, তাই এসব কথা আপনার কানে তুলিনি বাবা।

১ম চেলা। (ভ্যাঙ্চাইয়া) না বাবা! ওর সব মিছে কথা। ওকে আমি কতবার বলেছি, বাবাকে কথাটা বল, আর ও কেবলই বলে, রোগ লেগেছে ত ভালই হয়েছে, ভোগরাগটা জমবে ভাল।

২য় চেলা। খবরদার বলছি—মিছে কথা ব'লো না।

বাচ্চা সাধু। না বলবে না, সারাদিন শুধু খাঁটের তাল!

সাধু। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভোগ আর রাগ—দুইই হওয়া চাই।

বাচ্চা সাধু। কিন্তু বাবা রোজ দশ-বিশটা করে লোক মরে যাচ্ছে শুনে, আমার হাত-পা যে কাঁপছে!

সাধু। কাঁপছে কেন? গাঁজা খাও, ভাঙ্ খাও, কিন্তু মনে রাখতে হবে তিন ফুঁ—আর এক টান। বলো ব্যোম্ শঙ্কর মহাদেও।

সকলে। ব্যোম্ শঙ্কর মহাদেও!

(যে চেলাটি নিমকাঠের দণ্ড দিয়া এতক্ষণ সিদ্ধি ঘুঁটিতেছিল, সে একটা বড় লোটায় সিদ্ধি ঢালিয়া সাধুবাবাকে দিল। সাধুবাবা ঢক্ ঢক্ করিয়া তাহা পান করিলেন। পরে অন্যান্য চেলারা যথারীতি পরস্পরে একই লোটা হইতে উহা পান করিল।]

সাধু। তা নতুন চেলা আজ কখন বেরিয়েছে?

১ম চেলা। আপনার চা-প্রসাদ পেয়ে সেই সকালেই সে বেরিয়েছে।

সাধু। এ্যাঁ! তাই নাকি? কিন্তু সে এখনো ফির্‌লো না কেন?

১ম চেলা। আজ ক'দিনই তার ফির্‌তে দেরী হচ্ছে বাবা।

সাধু। "ভরদ্বাজ মুনি বসহিঁ প্রয়াগা—
বিনহিঁ রামপদ অতি অনুরাগা।"

দেখ, আমাদের প্রয়াগ যেতে হবে। আজই আমরা যাত্রা কোরব। তোমরা সব গোছগাছ করার ব্যবস্থা কর। প্রয়াগ-যাত্রার জন্যে মন আমার বড়ই চঞ্চল হ'য়ে উঠছে। জয় রামজী কী! জয় রামজী কী!

সকলে। জয় রামজী কী! জয় রামজী কী!

বাচ্চা সাধু। আঃ! আপনার মন চঞ্চল হ'য়েছে শুনে বাঁচলাম বাবা! (অপর চেলার প্রতি) এ ভাইয়া হাত গুটায়েকে কাহে বৈঠাগা? তাড়াতাড়ি গোছগাছ কয়্কে লেও বাবাকা হুকুম।

২য় চেলা। হ্যাঁ হ্যাঁ, গোছগাছ কয়্ছি।

(দেখা গেল সাধুরা জিনিস-পত্র সব একজায়গায় জড়ো করিতে লাগিল)

২য় চেলা। অত ব্যস্ত কেন? তুমি যে দেখছি, অসুখের ভয়ে মহাব্যস্ত হ'য়ে উঠেছ?

বাচ্চা সাধু। উঠব না? রোজ দশটা বিশটা ক'রে লোক পটাপট্ বসন্ত হ'য়ে মরে যাচ্ছে যে!

২য় চেলা। সাধু-সন্ন্যাসীর অত প্রাণের মায়া ভাল নয় বুঝ্লে?

বাচ্চা সাধু। আহা! কি কথাই বল্লে? আরে বাবা, প্রাণই যদি গেল, তাহলে আমাদের যে সংসার-বৈরাগ্য এসেছে, সে প্রমাণই বা করবে কে?

সাধু। হাঁ হাঁ, এ তো খাঁটি কথা আছে। কিন্তু আজই আমাদের প্রয়াগ যেতে হবে। বল জয় রামজী কী! জয় রামজী কী!

সকলে। জয় রামজী কী! জয় রামজী কী! (ঠিক এই সময় শ্রীকান্ত জ্বরে টলিতে টলিতে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া—)

বাচ্চা সাধু। এই যে, এসে গিয়েছ? ভালই হয়েছে। তোমার কথাই এতক্ষণ আমরা ভাবছিলাম। বাবার অনুরাগ হ'য়েছে—আজই প্রয়াগ যাইবেন—

শ্রীকান্ত। প্রয়াগ? আজই?

বাচ্চা সাধু। হ্যাঁ, তোমার জিনিস-পত্তর যা আছে, সব গোছগাছ ক'রে নাও।

শ্রীকান্ত। আমার আর গোছগাছের কি আছে ভাই—দু'খানা গেরুয়া বৈ তো নয়!

৩য় চেলা। আরে বাপু! গেরুয়া তো ধরেছ এই পনেরো দিন। তার আগে যেগুলো পরে এসেছিলে, তোমার সেই ছিটের সার্ট, সাদা গেঞ্জী, সাদা কাপড়, পায়ের জুতা, সেগুলো গোছ ক'রে নিতে হবে না?

শ্রীকান্ত। তার আর প্রয়োজন কি?

২য় চেলা। প্রয়োজন আছে বৈকি!

১ম চেলা। এই তো সবে পনের দিন এসেছ, এর পর যদি তোমার সাধুসঙ্গ সহ্য না হয়, তাহলে চট্‌ ক'রে গেরুয়া ছেড়ে, সেগুলো পরে বোঁ ক'রে পালাতে পারবে।

বাচ্চা সাধু। ঠিক্‌ ঠিক্‌, এই দেখ, আমার মাথার চুলে যতদিন না জটা বেঁধেছে ততদিন আমি বাপের দেওয়া জামা-কাপড় ঐ গেরুয়ার ঝোলায় বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছি। যদি ধোপে না টেঁকতাম, তাহ'লে ওগুলো পরে সোজা বাড়ীতে পিট্টান দিতাম।

৩য় চেলা। লেও ভেইয়া, গোছগাছ কর্‌কে লেও।

(শ্রীকান্ত সাধুবাবার নিকট আগাইয়া গিয়া বলিল)

শ্রীকান্ত। বাবা! এখুনিই কি আপনি প্রয়াগ যাত্রা কোরবেন?

সাধু। হাঁ বেটা।

শ্রীকান্ত। কিন্তু আমি তো আপনার সঙ্গে যেতে পারবো না বাবা!

সাধু। কেঁও বেটা?

শ্রীকান্ত। আমার খুব জ্বর এসেছে। আজ রাত্রে আমার পক্ষে বেরুনো অসম্ভব।

(সাধুবাবা ভয়ে সরিয়া বসিলেন। পরে কহিলেন)

সাধু। বোখার! (ভাল করিয়া দেখিয়া) হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমারা দোনো আঁখি-ভি লাল হুয়া!

বাচ্চা সাধু। এ্যাঁ! চোখ লাল হ'য়েছে বাবা!

৩য় চেলা। তাহ'লে তো বাবা ভাল কথা নয়! তুমি বাপু আর কষ্ট ক'রে আমাদের সঙ্গে যেও না, এখানেই থাকো।

সাধু। হ্যাঁ হ্যাঁ, থাকতে তো হবেই, এ অবস্থায় যাবেই ..ক ক'রে? আর আমরা নিয়ে যাবই বা কি করে?

শ্রীকান্ত। না বাবা! আমি আপনাদের সঙ্গে গিয়ে আপনাদের বিব্রত কোরতে চাইনে। আমি একটু আশ্রয় চাই। এই অবস্থায় তো আর গাছতলায় পড়ে থাকতে পারব না।

সাধুবাবা। ঠিকই তো! ভাখো আমি বলি কি, তুমি এক কাজ কর। সামনে রেলওয়ে স্টেশন আছে, সেখানে চলে যাও। বাবা ভোলানাথের কৃপায় কিছু না কিছু বন্দোবস্ত হ'য়ে যাবেই।

শ্রীকান্ত। হ্যা তাই যাই। তাহলে আমি আসি বাবা—

সাধু। আও বেটা, ভগবান তেরা বোখার আচ্ছা কর দে।

(শ্রীকান্ত টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল। এতক্ষণে অপর চেলাদের গোছগাছ সারা হইয়া গিয়াছে।)

১ম চেলা। বাবা! আমরা প্রস্তুত।

সাধু। বহুত আচ্ছা, উঠাও বেটা হামারা আসন। জয় রামজী কী। জয় রামজী কী!

সকলে। জয় রামজী কী! জয় রামজী কী!

বাচ্চা সাধু। ওকে দেখে আমার শরীরের মধ্যে কি-রকম করছে বাবা! হাত-পা কাঁপছে!

সাধু। ডর নেই, চলে আও বেটা! বলো ব্যোম্ শঙ্কর মহাদেও।

(দেখা গেল, জনৈক চেলা আসিয়া আসনটি গুটাইয়া লইল, সাধুবাবা ত্রিশূলটি হাতে লইয়া কয়েকবার উচ্চৈস্বরে 'ব্যোম্ ব্যোম্' রব করিলেন। পরে বাচ্চা চেলাকে কোলে লইয়া অন্যান্য চেলাদের সহিত প্রয়াগ অভিমুখে পিট্টান দিলেন।)

সপ্তম দৃশ্য

পাটনায় পিয়ারী বাইজীর ড্রয়িং রুম

ঘরটি আসবাব-পত্রে সুসজ্জিত। ঘরের মধ্যস্থলে একটি ঝাড় ঝুলিতেছে, দেওয়ালে কয়েকখানি বড় বড় ছবি টাঙান। তখন অপরাহ্নকাল। জনৈক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিকে সোফায় বসিয়া থাকিতে দেখা গেল। লোকটি পশ্চিমা, বেশভূষার পারিপাট্যে ভদ্রলোক যে অবস্থাপন্ন তাহা সহজেই বুঝা যায়। ভদ্রলোক পূর্ণিয়ার এক বিশিষ্ট জমিদার, নাম রামচন্দ্র সিংহ। এই ভদ্রলোকের সম্মুখে রতন দাঁড়াইয়াছিল, ভদ্রলোক বলিলেন—

জমিদার। কি ব্যাপার বল ত রতন? বাইজীর বাড়ীতে ঘুমুরের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল, গান-বাজনা বন্ধ হয়ে গেল—

রতন। ঐ ত বল্‌লাম বাবু, বাড়ীতে অসুখ, তাই—

জমিদার। গেল মাসে যখন পূর্ণিয়া থেকে পাটনায় আসি, তখনও তো শুনেছিলাম অসুখ।

রতন। হ্যাঁ বাবু, অসুখটা খুবই হয়েছিল কি না; তাই, মা গান-বাজনা তো দূরের কথা, এ দু-মাসের মধ্যে বাড়ীতে চেঁচিয়ে কাউকে একটা কথা পর্য্যন্ত কইতে দেননি।

জমিদার। বলি, অসুখটা কার?

রতন। একটি বাবুর।

জমিদার। বাবুটি কে?

রতন। খুবই আপনার জন, নইলে কেউ কি আর কারুর জন্যে এমনভাবে করে? কি সেবা করা, কি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, কি বোল্‌ব বাবু! সহরের বড় বড় ডাক্তার কেউ আর বাকি

ছিল না। আর মা তো দিনরাত মাথার গোড়ায় বসে যমের সঙ্গে লড়াই করেছেন।

জমিদার। বাবুটি এতদিন ছিলেন কোথায়?

রতন। মনের দুঃখে ঘর-সংসার ছেড়ে বুঝি বিবাগী হয়েছিলেন. শেষে ঘুরতে ঘুরতে আরা ষ্টেশনে এসে জ্বরে একেবারে বেহুঁস হয়ে পড়েন, ষ্টেশনের এক রেলের বাবু ঠিকানা জেনে নিয়ে, মাকে তার করেন। সেই তার পেয়ে, মা-তে আর দাদাবাবুতে গিয়ে নিয়ে আসেন।

জমিদার। তা বাবুটি এখন কেমন আছেন?

রতন। আজ্ঞে ভাল আছেন। পথ্যিও কোরেছেন, তবে খুব দুর্ব্বল।

জমিদার। তবে আর কি, রোগ ত ভালই হয়ে গেছে। তুমি একবার তোমার মাকে আমার নাম কোরে বলেই দেখ না?

রতন। মাফ করতে হবে বাবু। ওসব কথা এখন আমি মাকে বোলতে যেতে পারব না।

জমিদার। বড় আশা করে এসেছিলাম রতন। দুশো, পাঁচশো, হাজার, যা লাগে—

রতন। বুঝলাম। কিন্তু এখন তো আর কোন উপায় দেখছি না, কাজেই কি আর করা যাবে বলুন? আচ্ছা, তাহ'লে আসুন বাবু।

জমিদার। ও আচ্ছা। (প্রস্থান করিল)

রতন। যত আপদ! বল্‌লে কথা বোঝে না গা! যা এক কথায় মিটে যায়, তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একশোবার ধরে বলতে হবে? জ্বালাতন!

(রতন ঘর হইতে বিরক্তভাবে বাহির হইতে যাইবে এমন সময় বন্ধু ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল।)

বঙ্কু। কি রতন! ব্যাপার কি? কি হল? অত রাগ কচ্ছ কেন?

রতন। না না, রাগ করবো কেন। একা মানুষ, কোন্‌দিকে যে সাম্‌লাই দাদাবাবু, তা ভেবে পাই না—

(ইতিমধ্যে দেখা যায়, শীর্ণদেহে ধীরে ধীরে শ্রীকান্ত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। তাহাকে দেখিয়া রতন কহিল)

রতন। একি! আপনি বাইরে উঠে এলেন কেন বাবু?

শ্রীকান্ত। তাতে কি হয়েছে? এখন তো ভালই আছি। একটু-আধটু চলে-ফিরে না বেড়ালেই বা হবে কেন?

বঙ্কু। শরীরে বল পেলে ক্রমশঃই চলে-ফিরে বেড়াতে পারবেন। সবেমাত্র ক'দিন আগে তো পথ্য কোরেছেন। এখনও আপনার বেশ দিনকতক চুপচাপ শুয়ে থাকা দরকার।

শ্রীকান্ত। একা একা ঘরের মধ্যে আর ভাল লাগছিল না বঙ্কু, তাই তোমাদের সঙ্গে গল্প করবার জন্যে এ-ঘরে উঠে এলাম।

রতন। তা বেশ কোরেছেন বাবু। কথাবার্ত্তা কইলে মনটা একটু ভাল থাকবে। শুধু ওষুধে তো আর রোগ যায় না। সেইসঙ্গে মনের ফুর্ত্তিরও দরকার। আপনারা তাহলে বসে বসে গল্প করুন, দারোয়ানকে বলি, ফটকটা বন্ধ কোরে দিতে।

[প্রস্থান

বঙ্কু। মা আর আমি আরায় গিয়ে আপনাকে যে অবস্থায় দেখেছিলাম, তা মনে কোরলে আজও ভয় করে। কত বরফ যে আপনার মাথায় গেছে-তার আর ঠিক নেই।

শ্রীকান্ত। কোন জ্ঞানই আমার ছিল না। অচৈতন্য অবস্থায় ক'দিন যে আমার কেটেছে, তাও আমি জানি না।

বঙ্কু। আমরা তো দেখে মনে করলাম, আপনার নিশ্চয়ই বসন্ত বেরুবে। ওখানকার ডাক্তার দেখে বল্‌লেন, ভয় নেই, বসন্ত নয়,

শরীরের ওপর নানারকম অনিয়ম করার জন্যে জ্বরটা হয়েছে। কিন্তু মার তবুও ভয় যায় না।

শ্রীকান্ত। তোমার মার আর তোমার সেবা-যত্নেই ৫.... আমি যমের হাত থেকে মুক্তি পেলাম বঙ্কু !

বঙ্কু। তখন আপনার জ্বরটা সবেমাত্র একটু কমেছে। মা সকালে উঠেই বললেন—বঙ্কু, আর দেরী করিসনে বাবা, এইবার নিয়ে চল্। ও-রকম করে সেদিন আপনাকে আর কেউ আনতে পারতো কিনা জানি না। কিন্তু আমার মা পেরেছিলেন।

শ্রীকান্ত। তুমি কি মনে কর, তোমার মা অনন্যা ?

বঙ্কু। হ্যাঁ, আমি ঠিক তাই মনে করি।

শ্রীকান্ত। তুমি এ মার কাছে পড়াশুনার জন্যে কতদিন এসেছ ?

বঙ্কু। তা বছর-দুই হল।

শ্রীকান্ত। তোমরা ক'টি ভাই বোন ?

বঙ্কু। ভাই আর নেই, চারটি বোন।

শ্রীকান্ত। তাদের বিয়ে হয়ে গেছে ?

বঙ্কু। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার এই মাই তো বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন।

শ্রীকান্ত। তোমার আপন মা বেঁচে আছেন ?

বঙ্কু। আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনি দেশের বাড়ীতেই আছেন।

শ্রীকান্ত। তোমার এই মা কখনও তোমাদের দেশের বাড়ীতে গেছেন ?

বঙ্কু। হ্যাঁ। অনেকবার। এই তো পাঁচ-ছ'মাস হোল এসেছেন।

শ্রীকান্ত। সেজন্যে তোমাদের দেশে কোন গোলযোগ হয় না ?

বঙ্কু। হ'লই বা ! আমাদের একঘরে করে রেখেছে। কিন্তু তাই বলে তো, আমি মাকে ত্যাগ কোরতে পারি না।

শ্রীকান্ত। সে তো নিশ্চয়।

(বন্ধুর কথায় শ্রীকান্ত তাহার মুখের দিকে চাহিল, বন্ধু বলিয়া চলিল)

বন্ধু। আচ্ছা, আপনিই বলুন, গান-বাজনা করাতে কি কোন দোষ আছে ?

শ্রীকান্ত। না-না, দোষ কি !

বন্ধু। আমার মা তো শুধু তাই করেন। গ্রামের লোকের মত পরনিন্দা পরচর্চ্চা ত তিনি করেন না। বরং গ্রামে আমাদের যারা পরম শত্রু, তাদেরই আট-দশজন ছেলের এখনও পড়ার খরচ দেন।

শ্রীকান্ত। ও !

বন্ধু। শীতকালে কত লোককে কাপড় দেন, কম্বল দেন।

শ্রীকান্ত। তাই নাকি ?

বন্ধু। আজ্ঞে হ্যাঁ, এই দেখুন না, সে-বছর ইঁট পুড়িয়ে আমাদের কোঠা বাড়ী তৈরী হল, গ্রামে ভয়ানক জলকষ্ট দেখে মা আরও কিছু টাকা খরচ কোরে ইঁট খোলাটাকেই একটা পুকুর কাটিয়ে দিলেন। কিন্তু গাঁয়ের লোক এমন যে, সে পুকুর মাকে প্রতিষ্ঠা করতে দিলে না ! এ কি মায়ের কম কষ্ট !

শ্রীকান্ত। কষ্ট ত হবারই কথা।

বন্ধু। আচ্ছা, আপনি এখন কিছুদিন এখানে আছেন ত ?

শ্রীকান্ত। না, কাল সকালেই আমি যাচ্ছি।

বন্ধু। কাল ?

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ কালই।

বন্ধু। কিন্তু আপনার দেহ ত এখনও সবল হয়নি। আপনার কি মনে হচ্ছে অসুখটা একেবারে সেরেছে ?

শ্রীকান্ত। না-না ভালই আছি। তবে—আজ দুপুর থেকেই আবার মাথাটা ধরেছে—

বঙ্কু। তবে কেন এত শীগ্‌গির যাবেন? এখানে ত আর আপনার কোন কষ্ট নেই?

শ্রীকান্ত। না-না, দিব্যি আরামে রাজার হালে তোমাদের ছে আমি আছি।

বঙ্কু। তবে কেন শুধু শুধু আপনি যাবেন?

শ্রীকান্ত। এখানে থাকার জন্যে তুমিই বা আমায় এমনভাবে পীড়াপীড়ি কোরছ কেন বলত বঙ্কু?

বঙ্কু। কি জানেন, আপনি থাকলে, মা বড় আনন্দে থাকেন।

(কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল বঙ্কুর চোখ-মুখ লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। সে চট্ করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। বঙ্কুর এ ভাবান্তর শ্রীকান্তর চক্ষু এড়াইল না। সে হাঁটুর উপর দুই হাত দিয়া হাতের উপরে মাথা রাখিয়া মাটীর দিকে চাহিয়া কি যেন চিন্তা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে রাত্রের অন্ধকার ঘরটিকে ছাইয়া ফেলিল। রাজলক্ষ্মী "তুমি দিলে প্রেমাগুণ" গানটি গুণ গুণ করিয়া গাহিতে গাহিতে ঘরে প্রবেশ করিয়া আলোটি জ্বালিয়া বলিল)

রাজলক্ষ্মী। একি! তুমি? অন্ধকারে চুপি চুপি আমার এ ঘরে কী চুরি করতে এসেছিলে শুনি? আমার ঘরে তো তেমন কিছুই নেই—বলি, আমাকে নয় তো?

শ্রীকান্ত। আমাকে কি এমনি অকৃতজ্ঞ পেয়েছ? তুমি আমার এত কোরলে আর শেষে কিনা তোমাকেই চুরি কোরবো? আমি অত লোভী নই লক্ষ্মী!

রাজলক্ষ্মী। (হাসিয়া) নিজের জিনিস বুঝি কেউ চুরি কোরতে আসে? এই বুঝি তোমার বুদ্ধি? যাক, তোমাকে আর কৃতজ্ঞ হ'তে হবে না। দয়া করে যে সে সময়ে একটা খবর পাঠিয়েছিলে এই আমার ঢের!

শ্রীকান্ত। লক্ষ্মী! তোমার কাছে তো লুকোবার কিছু নেই, সবই তো জান। তুমি না গেলে, সে সময়—হয়ত ধুলো বালির ওপর মরে থাকতে হ'ত—কেউ হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থাও কোরতো না।

রাজলক্ষ্মী। সন্ন্যাসী সেজে কী হাঙ্গামাই না বাধিয়ে ছিলে?

শ্রীকান্ত। যে হ্যাঙ্গামাই বাধিয়ে থাকি না কেন, মনে রেখ তা তোমারই জন্যে।

রাজলক্ষ্মী। কি রকম?

শ্রীকান্ত। এও সেই দীঘির পাড়ে অকারণে ঘুরে বেড়ানর মত। বাড়ী থেকে পাটনায় তোমার কাছে আসব বলে টিকিট কিনে বেরিয়ে পড়লাম কিন্তু পথে বেরুনোর পর, কিরকম যেন সঙ্কোচ হোল। পাটনার আগের ষ্টেশনে নেমে পড়লাম। তারপর—

রাজলক্ষ্মী। তারপর আর বলতে হবে না। সাধুর দলে ভীড়ে পড়লে। গিয়ে দেখি, মাটীর ওপর ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে অঘোর অচৈতন্য! উঃ! সেদিনটা আমার কি বিপদের দিনই না গেছে। কি শুভক্ষণেই যে পাঠশালায় দু-জনের চার চক্ষে দেখা হয়েছিল! যে দুঃখ তুমি আমাকে দিলে, এত দুঃখ ভূ-ভারতে কেউ কাউকে দেয়নি, দেবে না।

শ্রীকান্ত। সে কথা মিথ্যা বলোনি লক্ষ্মী! দুঃখের দিনে স্মরণ কোরতে বোলেছিলে বোলেই আমার জন্যে তোমার অনেক দুঃখ পেতে হ'লো। আরও কত পেতে হবে কে জানে, নেহাৎ পরমায়ু ছিল বলে তোমার কথা মনে পড়েছিল, তা এখন বেশ বুঝতে পারি।

রাজলক্ষ্মী। পারো?

শ্রীকান্ত। নিশ্চয়ই।

রাজলক্ষ্মী। তা হ'লে আমার জন্যে প্রাণটা ফিরে পেয়েছ বল?

শ্রীকান্ত। তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।

রাজলক্ষ্মী। তা হ'লে ওটা দাবী কোরতে পারি বোধ হয়।

শ্রীকান্ত। তা পার। কিন্তু আমার এই তুচ্ছ প্রাণটার জন্যে তোমার তো এত লোভ হওয়া উচিত নয়।

রাজলক্ষ্মী। তবু ভাল যে, নিজের দামটা এতদিনে টের পেলে।

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ, আর বিশেষ করে কালকেই তা বুঝতে পেরেছি।

রাজলক্ষ্মী। হোষ্টেল থেকে কাল বঙ্কু আসায় তোমাকে চলে যেতে বলেছি বলে আমার ওপর অভিমান করেই কি একথা বল্‌ছ ?

শ্রীকান্ত। না লক্ষ্মী, তুমি যে কারণে আমাকে এখান থেকে যেতে বলেছ—সে কারণটা যেমন যুক্তিপূর্ণ, তেমনি সুস্পষ্ট।

রাজলক্ষ্মী। পেটে না ধরলেও—বঙ্কু আমার সতীন-পো ত বটে ! ছেলে বড় হ'লে মাকে একটু সমীহ ক'রে চলতে হয়।

শ্রীকান্ত। সে তো ঠিক কথা। না-না, আমি কাল সকালেই চলে যাব।

রাজলক্ষ্মী। যেতে বলেছি বলে, মাথার দিব্যি দিয়ে এমন করে বলিনি যে, কাল সকালেই তোমাকে চলে যেতে হবে।

শ্রীকান্ত। না না, তা নয় লক্ষ্মী, ভেবে দেখলাম, বঙ্কু থাকতে থাকতেই আমার চলে যাওয়া উচিত।

রাজলক্ষ্মী। কিন্তু এই দুর্ব্বল শরীরে কাল সকালের গাড়ীতে যেতে পারবে কি ?

(রাজলক্ষ্মীর এই কথার মাঝে বঙ্কু ঘরে আসিয়া প্রবেশ করে এবং বলে—)

বঙ্কু। আমিও ঠিক ঐ কথাই বলছিলুম মা ! তা ছাড়া আজ দুপুর থেকে ওঁর মাথাটা ধরেছে—

রাজলক্ষ্মী। মাথা ধরেছে ? সে কি ! কই, একথা বলনি তো ? বেশ মানুষ যা হোক ! হিমে দিব্যি এ ঘরে এসে বসে আছ, যাও যাও, ও-ঘরে যাও।

শ্রীকান্ত। অবাক্ করলে লক্ষ্মী! এখানে আবার হিম কোথায়?

রাজলক্ষ্মী। হিম না থাক্, ঠাণ্ডা বাতাস বইছে তো? ওরে বঙ্কু! রতনকে দিয়ে ওডিকলোনের শিশিটা পাঠিয়ে দেতো।

[বঙ্কু চলিয়া গেল

শ্রীকান্ত। কেন ব্যস্ত হ'চ্ছ লক্ষ্মী, এখানে ঠাণ্ডা গরম কোন বাতাসই বইছে না।

রাজলক্ষ্মী। তুমি বললেই হবে? ঠাণ্ডা কি গরম সেটুকুও বুঝতে ভুল কোরবো?

শ্রীকান্ত। মাথা ধরা শুনেই তুমি ব্যস্ত হয়ে উঠেছ। তাই বুঝতে সত্যিই তোমার ভুল হচ্ছে লক্ষ্মী!

রতন। মা! (হাতে ওডিকোলনের শিশি ও জল লইয়া প্রবেশ এবং রাজলক্ষ্মী সেগুলি লইলে রতনের প্রস্থান)

রাজলক্ষ্মী। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার সমস্তই ভুল। কিন্তু মাথা ধরাটা ত আমার ভুল নয়—সেটা তো সত্যি? (কপালে হাত দিয়া দেখিল)

শ্রীকান্ত। কি দেখছ? জ্বর? না না জ্বর টর কিছু না।

রাজলক্ষ্মী। মাথাটা কি খুবই ধরেছে?

শ্রীকান্ত। না, যেতে পারব।

রাজলক্ষ্মী। কিন্তু না গেলেই কি নয়?

শ্রীকান্ত। না, যেতে আমাকে হবেই।

রাজলক্ষ্মী। তা হ'লে বাড়ী পৌছে একটা খবর দিও, নইলে আমাদের বড় ভাবনা হবে।

শ্রীকান্ত। আচ্ছা। ভবঘুরে লোক আমি কোথায় যাব কিছুই ঠিক করিনি। কিন্তু তুমি যখন বার বার বাড়ীর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছ লক্ষ্মী, তখন বাড়ীতেই যাব; আর গিয়েই তোমাকে খবর দেবো।

রাজলক্ষ্মী। দিও, আর আমিও চিঠি লিখে পরে দু'একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা কোরবো।

শ্রীকান্ত। কিন্তু ইচ্ছে কোরলে সে কথা তুমি এখনও জিজ্ঞাসা কোরতে পার লক্ষ্মী!

রাজলক্ষ্মী। তার সময় এখনও আসেনি।

শ্রীকান্ত। এসেছে। কিন্তু সামনা-সামনি তুমি সে কথা বোলতে পারছ না। তাই দূর থেকে তা জানতে চাইছ। শোন লক্ষ্মী, তোমার আমার মাঝখানে বঙ্কু এসে দেখা না দিলে হয়ত আমি এখানে থেকেই যেতাম। আর তার ফলে একটা সত্যকে হয়ত আমি কোনদিনই উপলব্ধি কোরতে পারতাম না। কিন্তু সেই সত্যকে এখন আমি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি কোরছি। দেখছি, বড প্রেম শুধু কাছেই টানে না। দূরেও ঠেলে দেয। ছোট-খাট প্রেমের সাধ্যও ছিল না যে, এই সুখৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্নেহ-স্বর্গ থেকে মঙ্গলের জন্য কল্যাণের জন্য আমাকে এক পা নাড়ায। মহৎ প্রেমের মহান্ ঐশ্বর্য্য তুমি আমার হাতে তুলে দিযেছ। তোমার ঋণ ইহজীবনে শোধ করার শক্তি আমার নেই। কিন্তু যে জীবন তুমি দান করেছ, সে-জীবনের অপব্যবহার ক'রে আর যেন তোমায় আমি অপমান না করি, লক্ষ্মী! আর যেন তোমায় আমি অপমান না করি।

(উপরোক্ত কথার মাঝে দেখা যায়, রাজলক্ষ্মীর দু'চোখ বাহিয়া অশ্রু গড়াইতেছে। সে গলবস্ত্রে ধীরে ধীরে শ্রীকান্তকে প্রণাম করিল।)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বর্ম্মাগামী জাহাজের ডেক

হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, বাঙালী, কাবুলিওয়ালা, মুসলমান, চীনা, বর্ম্মী প্রভৃতি নানা জাতীয় লোককে এই ডেকের ভিতর মোটঘাট লইয়া বসিয়া থাকিতে দেখা গেল। প্রত্যেকের সহিত কিছু মোটঘাট আছে। এই মোটঘাটগুলি আড়াল করিয়া প্রত্যেকে নিজের আসন নির্দ্দেশ করিয়া লইয়াছে। স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিচারে একই সঙ্গে ইহার মধ্যে বসিয়া আছে। এই ডেকের একপাশে একটি সিঁড়ি লাগান। এই সিঁড়ি দিয়া জাহাজের উপরে উঠা ও নামা যায়। গত রাত্রে সমুদ্রবক্ষে সাইক্লোন দেখা দিয়াছিল। সাইক্লোনের তাড়নায় ডেকের যাত্রীরা সারারাত গড়াগড়ি খাইয়া এখন কাতর হইয়া পড়িয়াছে। উপরের সিঁড়ি দিয়া শ্রীকান্তকে নীচে নামিয়া আসিতে দেখা গেল। নন্দ মিস্ত্রী নামে জনৈক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি শ্রীকান্তকে নামিতে দেখিয়া হাত নাড়িয়া কহিল—

নন্দ মিস্ত্রী। ও মশাই, শুনছেন?

শ্রীকান্ত। আমাকে ডাকছেন?

নন্দ মিস্ত্রী। আজ্ঞে হ্যাঁ। আসুন না, একটু আলাপ করা যাক্।

(শ্রীকান্ত আগাইয়া গেল ও বলিল—)

শ্রীকান্ত। আর আলাপ! কাল যে কাণ্ড হয়ে গেল!

নন্দ মিস্ত্রি। ও! সাইক্লোনের কথা বলছেন? তা বর্ষাবাদলের দিনে জাহাজে উঠলে সবতো একটু-আধটু সইতেই হয় মশাই। বাংলা

দেশ থেকে বর্ম্মামুলুকে যেতে অন্ততঃ বার-তিনেক এই রকম সাইক্লোন আমায় ভোগ করতে হ'য়েছে।

শ্রীকান্ত। বর্ম্মা মুলুকে আপনি বুঝি বহুকাল আছেন?

নন্দ মিস্ত্রী। হাঁ, তা হলো বৈকি বছর তিরেশেক।

শ্রীকান্ত। মহাশয়ের কি করা হয়?

নন্দ মিস্ত্রি। মেকানিক—মানে, মিস্ত্রী। রেঙ্গুন সহরে আমায় সকলে নন্দ মিস্ত্রী বলে জানে। তা আপনি কি...

শ্রীকান্ত। আমি ব্রাহ্মণ। রেঙ্গুনে যাচ্ছি কাজের চেষ্টায়।

নন্দ মিস্ত্রী। আপনারা লেখাপড়া জানা লোক ওখানে গিয়ে পৌছুলে যাহোক জুটে যাবেই। রেঙ্গুনে গিয়ে যদি কোন অসুবিধা হয়, আমায় খোঁজ করবেন। আপনাদের আশীর্ব্বাদে রেঙ্গুন সহরে এই বিখ্যাত নন্দ মিস্ত্রীকে সবাই চেনে। একবার নাম করলেই যে কোন লোক এই অধমের গরীবখানা দেখিয়ে দেবে।

শ্রীকান্ত। সম্পূর্ণ অচেনা অজানা জায়গায় যাচ্ছি আপনার সঙ্গে আলাপ হ'য়ে ভালই হ'ল।

(নন্দ মিস্ত্রীর সহিত শ্রীকান্তের উপরোক্ত কথার মাঝে টগরকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকিতে দেখা যায়। শ্রীকান্তর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টগর নন্দকে বলে—)

টগর। দাও দেখি জলের কুঁজোটা এগিয়ে—

(নন্দ কুঁজোটা আগাইয়া দেয়, শ্রীকান্ত জিজ্ঞাসা করে—)

শ্রীকান্ত। ইনি?

নন্দ মিস্ত্রী। বাবু-মশায়, ইনি আমার পরি.........

টগর। উঃ—পরিবার, আমার সাত-পাকের সোয়ামী আছেন। পরিবার। খবরদার বলছি মিস্ত্রী। যার তার কাছে মিছে কথা বলে আমার বদনাম কোরো না বলে দিচ্ছি।

নন্দ মিস্ত্রী। আহা! রাগ করিস্ কেন টগর? বলি বিশ বছর—

টগর। হোলই বা বিশ বছর, পোড়া কপাল! জাত বোষ্টুমের মেয়ে আমি, তোমার মত ছোট জাতের পরিবার হ'তে যাব কেন? কিসের দুঃখে? বিশ বছর ঘর করছি বটে, কিন্তু একদিনের তরে তোমায় হেঁসেলে ঢুক্‌তে দিয়েছি কি? সে-কথা কারো বলবার জো নেই! টগর বোষ্টমী মরে যাবে তবু জাত খোয়াবে না তা জানিস?

নন্দ মিস্ত্রী। দেখলেন মশায়, দেখলেন, এখনও এদের জাতের দেমাক দেখলেন তো! আমি তাই সহ্য করি, আর কেউ হ'লে—

(টগর কোমরের কাপড় জড়াইতে জড়াইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল)

টগর। বলি, আর কেউ হলে আমার করতো কি? মাথাটা কি কেটে নিত?

শ্রীকান্ত। (হাসিয়া) না না, মাথা কেটে নেবে কেন? মাথা কাটা কি মুখের কথা?

টগর। তাই বলুন তো বাবুমশাই।

শ্রীকান্ত। তা যাক্, সাইক্লোনে রাত আপনাদের কাটলো কেমন?

নন্দ মিস্ত্রী। বেশ কেটেছে।

টগর। বেশ না ছাই! মাগো মা! কী কাণ্ডই না হ'য়ে গেল!

শ্রীকান্ত। কাণ্ড?

নন্দ মিস্ত্রী। না না, কাণ্ড এমন কিছু নয় মশায়। বলি কোল-কাতার গলির মোড়ে সাড়ে-বত্রিশ ভাজা বিক্রি করা দেখেছেন তো! সাইক্লোনের দাপটে আমাদের অবস্থাও হ'য়েছিল ঠিক ঐ সাড়ে-বত্রিশ ভাজারই মতন।

শ্রীকান্ত। তার মানে?

নন্দ মিস্ত্রী। মানে ফেরিওয়ালা যেমন ঠোঙার নীচে গোটা দুতিন টোক মেরে ভাজা চাল, ডাল, মটর, কড়াই, ছোলা, বরবটি, মুগুরী,

খেঁসারী সব একাকার করে দেয়—ভগবানের কৃপায় আমরাও ঠিক সেই রকম মিশে গিয়েছিলাম। এই খানিকক্ষণ হোল আমরা যে যার কোট চিনে ফিরে এসে বসেছি। মশায় ভাগ্যে আসল বোষ্টমের জাত যায় না, নইলে টগর আমার—

টগর। আবার? ফের—

নন্দ মিস্ত্রী। না তবে থাক্। কিন্তু আজ তা'হলে খাওয়া-দাওয়া কি হবে বল?

টগর। মরণ আর কি! হবে কি ক'রে শুনি?

শ্রীকান্ত। না না, হবে বৈকি! এই তো সবে সকাল। একটু বেলা হ'লে—

নন্দ মিস্ত্রী। কোলকাতা থেকে দিব্যি একহাঁড়ি রসগোল্লা আনা হোয়েছিল মশায়। জাহাজে উঠে পর্য্যন্ত বলেছি, আয় টগর কিছু খাই। আত্মাকে কষ্ট দিসনি—নাঃ রেঙ্গুনে নিয়ে যাব। (টগরের প্রতি) যা না এইবার তোর রেঙ্গুনে নিয়ে।

শ্রীকান্ত। শেষ পর্য্যন্ত কি হোল রসগোল্লার?

নন্দ মিস্ত্রী। কি হোল বলতে পারিনে। ঐ দেখুন, ভাঙা হাঁড়ি, আর ঐ দেখুন, বিছানাময় তার রস। এর বেশী যদি কিছু জানতে চান তাহ'লে, ঐ দুই হারামজাদাকে জিজ্ঞাসা করুন।

(অদূরে দেখা গেল, দুই কাবুলিওয়ালা তখন রুটির সহিত রসগোল্লা খাইতেছে। নন্দর কথায় আত্মসংবরণ করিয়া বলিল)

শ্রীকান্ত। তা যাক্—সঙ্গে চিঁড়ে আছে তো?

নন্দ মিস্ত্রী। সেদিকেও সুবিধে হ'য়েছে। বাবুকে একবার দেখা ত টগর—বাবুকে একবার দেখা না।

(টগর একটা ছোট পুঁটলি ফেলিয়া দিয়া বলিল)

টগর। দেখাও গে তুমি—

নন্দ। যাই বলুন বাবু, কাবুলী জাতটাকে নেমকহারাম বলা যায় না। ওরা রসগোল্লা যেমন খায়। তেমনি ও'র কাবুল দেশের মোটা মোটা রুটি অমনি দিয়ে দেয়। ফেলিসনে টগর তুলে রাখ তোর মালসা ভোগে লেগে যেতে পারে।

(শ্রীকান্ত হাসিয়া উঠিল)

টগর। জাত তুলে কথা ক'য়োনা মিস্ত্রী ভাল হবে না, তা বলে দিচ্ছি।

নন্দ মিস্ত্রী। মাথা খাস টগর রাগ করিসনে। আমি তামাসা করেছি বৈ তো নয়।

টগর। কিসের তামাসা ? জাত তুলে আবার তামাসা। ওর ঐ রুটি দিয়ে আমার মালসা-ভোগ হবে। তোর মুখে আগুন—দরকার থাকে তুই তুলে রাখ্‌গে—বাপের পিণ্ডি দিস্‌—

(নন্দ টগরের কেশাকর্ষণ করিয়া কহিল)

নন্দ মিস্ত্রী। কি হারামজাদী ! তোর এরবড় আস্পর্দ্ধা, তুই আমার বাপ তুলিস্‌ ?

(টগর কোমরের কাপড় জড়াইতে জড়াইতে)

টগর। হারামজাদা ! তুই শুধু-শুধু কেন আমার জাত-তুল্‌লি ?

(উভয়ে মল্লযুদ্ধ বাঁধিয়া গেল)

শ্রীকান্ত। আহা ! করেন কি, করেন কি ? ছি-ছি-ছিঃ !

(এতক্ষণে টগর নন্দর বাহুর একাংশ কামড়াইয়া ধরিয়াছে ও শ্রীকান্ত তাহাদের প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে। ডেকের অন্যান্য যাত্রীরা নন্দ ও টগরের মল্লযুদ্ধ বেশ উপভোগ করিতেছে। দেখা গেল, জাহাজের ডাক্তারবাবু ইতিমধ্যে সিঁড়িতে আসিয়া শ্রীকান্তকে লক্ষ্য করিয়া ডাকিতেছেন)

ডাক্তার। চলে আসুন মশায়, ও ঝামেলার মধ্যে থাকবেন না—চলে আসুন। (শ্রীকান্ত ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পাশের সিঁড়ি দিয়া উপরে

চলিয়া গেল। ডেকের উপর-তলা। শ্রীকান্তকে একখানি চেয়ার আগাইয়া দিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন)

ডাক্তার। বসুন। আরে মশায় ও ঝামেলার মধ্যে যেতে আছে? আপনাকে তো মশায় খুব তাজা দেখাচ্ছে। বোধ করি একটা হ্যাঁমক্ পেয়েছিলেন না?

শ্রীকান্ত। হ্যাঁমক কোথায় পাব? ডাক্তারবাবু! এই অধমও যে ঐ নরককুণ্ডের যাত্রী।

(ইতিমধ্যে জনৈক অল্পবয়স্ক মুসলমান যুবক আসিয়া শ্রীকান্তকে বলিল)

মুসলমান যুবক। বাবুমশায়, একটি বাঙালী মেয়েলোক আপনাকে ডাকতেছে।

শ্রীকান্ত। মেয়েলোক?

মুসলমান যুবক। আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীকান্ত। দেখুন তো মশায় ফ্যাসাদ!

ডাক্তার। আরে মশায়! ঐ ফ্যাসাদের জন্যেই তো আপনাকে ডেকে ওপরে তুললাম।

শ্রীকান্ত। আচ্ছা ডাক্তারবাবু আমি দেখে এখুনি আসছি।

(শ্রীকান্ত মুসলমান যুবকটির সহিত সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল। ডেকের অভ্যন্তর। যাত্রীদের ভীড়ের মধ্যে একদিকে দেখা গেল জনৈক যুবক অসুস্থ অবস্থায় শুইয়া আছে। তাহার পার্শ্বে যুবকের প্রায় সমবয়সী এক মহিলাকে শুশ্রূষা করিতে দেখা গেল। স্ত্রীলোকটি সধবা, সিঁথায় সিঁদুর, হাতে নোয়া ও শাঁখা ছাড়া অন্য কোন অলঙ্কার নাই। পরণে সাদাসিদে রাঙাপেড়ে শাড়ী। অসুস্থ ব্যক্তিটির নাম রোহিণী ও শুশ্রূষাকারিণীর নাম অভয়া। শ্রীকান্ত নিকটে আসিলে অভয়া ঈষৎ ঘোমটা টানিয়া দিল।)

মুসলমান যুবক। এই যে, ইনিই আমাকে ডাকতেছেন।

শ্রীকান্ত। আপনি আমায় ডাকছেন?

অভয়া। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার সঙ্গে ডাক্তারবাবুর তো আলাপ আছে। একবার ডেকে আনতে পারেন?

শ্রীকান্ত। আলাপ অবশ্য অল্প সময়ের। তবে মনে হয় ডাক্তারবাবু লোক ভাল। কিন্তু কি প্রয়োজন বলুন তো?

অভয়া। (শ্রীকান্তর প্রতি) রোহিণীদার অসুখী দেশেতেই হয়েছিল। কাল থেকে আবার জ্বর হয়েছে। এখন দেখছি, জ্বর খুববেশী। একটা কিছু ওষুধ না দিলেই নয়।

(শ্রীকান্ত রোহিণীর কপালে হাত দিয়া দেখিয়া বলিল)

শ্রীকান্ত। তাই তো! আচ্ছা আমি দেখছি।

(শ্রীকান্ত ডেকের যাত্রীদের মধ্য দিয়া উপরে উঠিবার সিঁড়ির দিকে যাইতেছিল। নন্দ মিস্ত্রী ফলাহারের ব্যবস্থা করিতেছিল এবং টগর শিরঃপীড়ায় কাতর হইয়া মাথায় পাগড়ী জড়াইতেছিল, শ্রীকান্তকে দেখিয়া নন্দ কহিল)

নন্দ মিস্ত্রী। এই যে বাবুমশায়, নমস্কার!

শ্রীকান্ত। নমস্কার! কি? ফলাহারের ব্যবস্থা করছেন?

নন্দ মিস্ত্রী। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার সঙ্গে যে কথা কইছিল, ঐ মেয়েমানুষটা কে মশাই?

টগর। (মাথায় পাগড়ী বাঁধিতে বাঁধিতে) তোমার সে খবরে কাজ কি শুনি? আমি মরছি মাথার যন্ত্রণায়—সেদিকে খোঁজ নেই। আর কে কার সঙ্গে কথা বলছে—সেইদিকে চেয়ে বসে আছে!

নন্দ মিস্ত্রী। দেখলেন মশাই, মাগীর কি ছোট মন! কে বাঙালী মেয়েটা রেঙ্গুনে যাচ্ছে—খবরটা নিতেও দোষ?

(টগর পাগড়ীটি ফেলিয়া দিয়া শ্রীকান্তকে বলিল)

টগর। তা'হলে আপনাকে বলি শুনুন বাবুমশায়! টগরা বোষ্টুমীর হাত দিয়ে, ওর মত কতগণ্ডা মিস্ত্রী মানুষ হ'য়ে গেল! আর ও কি না আমার চোখে ধূলো দিতে চায়। আরে! তুই ডাক্তার না বদ্যি যে যাই একটু জল আনতে গেছি—অমনি ছুটে দেখতে গেছিস্? কেন? কিন্তু ভাল হবে না বলে দিচ্ছি মিস্ত্রী! আর যদি ওদিকে যেতে দেখি, তো তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন—

নন্দ মিস্ত্রি। তোর কি আমি পোষা বাঁদর যে, যেদিকে শেকল ধরে নিয়ে যাবি যেদিকে যাব? আমার ইচ্ছে হ'লে আবার গিয়ে বেচারাকে দেখে আসব—যা পারিস তা করিস—

টগর। আচ্ছা।

(শ্রীকান্ত চলিয়া গেল, নন্দ ফলাহারে মন দিল)

(ডেকের উপরতালা। ডাক্তারবাবু বসিয়াছিলেন, শ্রীকান্তর চেয়ার শূন্য, টেবিলের ওপর দুই কাপ চা ও বিস্কুট। শ্রীকান্তকে দেখিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন)

ডাক্তার। এই যে, আসুন আসুন। আপনার জন্যে চা প্রস্তুত করে রেখেছি।

(শ্রীকান্ত চায়ের কাপে হাত দিল)

তারপর ব্যাপার কি?

শ্রীকান্ত। ডেকের এক ভদ্রলোক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাই তাঁর সঙ্গের মেয়েলোকটি আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আপনি যদি একবার তাঁকে গিয়ে দেখেন—

ডাক্তার। হয়েছে কি?

শ্রীকান্ত। জ্বর।

ডাক্তার। একটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি। এখন তো এই ওষুধটা খান, পরে গিয়ে না হয় দেখে আসবো। রুগীর নামটা কি?

শ্রীকান্ত। নাম বল্লতো—রোহিণী।

ডাক্তার। আচ্ছা, ওষুধটা লিখে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি।

(ডাক্তারবাবু টেবিলের উপরিস্থিত প্যাড লইয়া ফাউণ্টেন্‌পেন দিয়া প্রেস্‌ক্রিপসন্‌ লিখিতে বসিলেন। প্রেস্‌ক্রিপসন্‌ লেখা হইয়া গেলে ঘণ্টা বাজাইলেন। জাহাজের জনৈক চাকর আসিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তারবাবু তাহার হাতে প্রেস্‌ক্রিপসনটা দিয়া বলিলেন—)

ডাক্তার। ডাক্তারখানা থেকে এই ওষুধটা তৈরী করে নিয়ে, ডেকের এই নামের রোগীর খোঁজ করে তার হাতে দিয়ে আসবে।

(চাকরটি চলিয়া গেল)

শ্রীকান্ত। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, কাল কখন জাহাজ রেঙ্গুনে গিয়ে ভিড়বে ?

ডাক্তার। তা বেলা ১১টা-১২টা হবে। কিন্তু আজ আর আপনাকে ছাড়ছি না ম'শায়। আপনার মত সঙ্গী পেয়ে, সময়টা একদিন কাটছে মন্দ নয়। আজ রাত্রে কিন্তু আমার কাছে খাবেন, নেমন্তন্ন রইল।

শ্রীকান্ত। যে আজ্ঞে।

ডেকের অভ্যন্তর

তখন গভীর রাত্রি। কেবল জাহাজ চলার আওয়াজ ও জলের কলরোল শোনা যাইতেছিল। অভয়া ও রোহিণীকে ডেকের একপাশে বসিয়া থাকিতে দেখা গেল। রোহিণীকে এখন অনেকটা সুস্থ বলিয়া বোধ হয়। সে কয়েকটি বালিশে হেলান দিয়া বসিয়াছিল। অভয়া তোরঙ্গের উপর বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল। ডেকের অধিকাংশ যাত্রীরা তখন নিদ্রিত, কেবল নন্দ মিস্ত্রী একটি পোঁটলার উপর পা তুলিয়া দিয়া সিগারেট টানিতেছিল। ইহারই মাঝে দেখা যায়, ধীরে ধীরে শ্রীকান্ত প্রবেশ করে। অভয়া ও রোহিণী কথা কহিতেছিল।

অভয়া। তোমার আর একবার ওষুধ খাওয়ার সময় হয়েছে, এই বেলা খেয়ে নাও।

রোহিণী। না। দু'দাগ ওষুধ তো খেয়েছি। আর কত খাব ?

অভয়া। আজ রাত্রের ভেতর তিন দাগ তোমার খেতেই হবে। নাও।

(অভয়া রোহিণীর হাতে ওষুধ দিল, রোহিণী ওষুধ খাইয়া গেলাস নামাইয়া রাখিল। ইতিমধ্যে শ্রীকান্ত সেখানে আসিয়া বলিল—)

শ্রীকান্ত। এই যে! উঠে বসেছেন দেখছি। আপনাকে ও-বেলায় দেখে সত্যিই ভয় হয়েছিল। যাক্—ওষুধটা যে আপনার কাজে লেগেছে সেই ভাল।

অভয়া। আপনাকে সে-সময়ে না পেলে যে কি হোত!

শ্রীকান্ত। আমি উপলক্ষ। আপনার সেবাযত্ন আর বুদ্ধির গুণেই উনি বেঁচে উঠলেন। তা আপনারা কোথা থেকে আসছেন ?

অভয়া। আমাদের দেশ বালুচরের কাছে।

শ্রীকান্ত। আপনারা কি ?

অভয়া। উত্তররাঢ়ী কায়স্থ।

শ্রীকান্ত। (রোহিণীর প্রতি) আপনি কি বর্ম্মাতেই চাকরী করেন ?

রোহিণী। না। (অভয়াকে দেখাইয়া) আমি একে রেঙ্গুনে পৌছে দিতে যাচ্ছি। এঁর স্বামী রেঙ্গুনে চাকরী করেন।

শ্রীকান্ত। ইনি আপনার—

রোহিণী। গ্রাম-সম্পর্কে বোন।

শ্রীকান্ত। মশায়ের নাম ?

রোহিণী। রোহিণী সিংহ, আপনারা ?

শ্রীকান্ত। ব্রাহ্মণ।

রোহিণী। নামটি জানতে পারি কি ?

শ্রীকান্ত। বিলক্ষণ। আমার নাম শ্রীকান্ত শর্ম্মা। (অভয়ার প্রতি) আপনি বুঝি একা দেশে বেড়াতে এসেছিলেন?

অভয়া। আজ্ঞে না, আমি এই প্রথম রেঙ্গুনে যাচ্ছি। আমার স্বামী আজ আট বছর হোল রেঙ্গুনে চাকরী করতে এসেছিলেন। গোড়ায় বছর দুই চিঠি-পত্র দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর এ ছ'বছর আর তাঁর কোন খোঁজ-খবর নেই। দেশে মা ছিলেন, মাসখানেক হোল তিনিও মারা গেছেন। অভিভাবকও কেউ নেই যে, তার কাছে থাকি। তাই রোহিণী-দাদাকে রাজী করিয়ে, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বর্ম্মায় তাঁর খোঁজে যাচ্ছি। আপনি কি রেঙ্গুনেই থাকেন?

শ্রীকান্ত। আজ্ঞে না। চাকরীর চেষ্টায় রেঙ্গুনে চলেছি। জানি না অদৃষ্টে কি আছে।

অভয়া। তা হলে তো আপনার অবস্থা আমাদেরই মত। যাক্— অচেনা অজানা জায়গা—প্রয়োজন হলে আপনি আমাদের একটু সাহায্য করবেন—

শ্রীকান্ত। ক'রবো।

অভয়া। আচ্ছা আপনিই বলুন, এতটুকু চেষ্টা না করে, কোন-মতে দেশের বাড়ীতে পড়ে থাক্‌লেই কি আমার ভাল কাজ হ'তো? তা ছাড়া এ বয়সে দুর্নাম কিনতেই বা কতক্ষণ?

শ্রীকান্ত। ঠিকই তো। আচ্ছা, কেন তিনি এতকাল আপনার খোঁজ নেন না—তার কিছু জানেন?

অভয়া। না। কিছুই জানি না। তবে—রেঙ্গুনেই ছিলেন। বর্ম্মা রেলওয়েতে কাজ করতেন। কত চিঠি দিয়েছি, কিন্তু জবাব পাইনি। অথচ আমার একটা চিঠিও কোনদিন ফিরে আসেনি। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় তিনি বেঁচে নেই?

শ্রীকান্ত। আমার ঠিক তার উল্টোটাই মনে হয়। তিনি যে বেঁচে আছেন, একথা আমি শপথ করে বোলতে পারি।

(অভয়া শ্রীকান্তের পায়ের ধূলা লইয়া)

অভয়া। আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক শ্রীকান্তবাবু। আমি আর কিছু চাইনে, তিনি বেঁচে থাকলেই হ'লো।

শ্রীকান্ত। ডাক্তারবাবুর কাছে শুনছিলাম, বর্ম্মা মুলুকে বাঙালীর ছেলেরা চাকরী করতে এসে অনেকেই নাকি নতুন করে ঘর-সংসার পেতে বসেছে।

রোহিণী। অভয়ার স্বামী সম্পর্কে আমারও ঠিক ঐ রকম ধারণা। নইলে চিঠি দিলে চিঠির উত্তর দেবে না কেন ?

শ্রীকান্ত। ঠিকই তো।

অভয়া। তা হোক। তিনি যদি আর একটা সংসার পেতে বসেই থাকেন, তার জন্যে আমি ভয় করিনে। সতীন নিয়ে আমি খুব ঘর করতে পারবো। আপনি হয়তো ভাবছেন শ্রীকান্তবাবু, আমি ঘর কোরতে রাজী হলেই তো হ'ল না, আমার সতীন রাজি হবে কি না ?

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ তাই যদি হয়, তাহলে আপনি কি কোরবেন ?

অভয়া। সে বিপদে আপনি আমাকে একটু সাহায্য করবেন শ্রীকান্তবাবু। রোহিণী-দাদা বড্ড সাধাসিধে ভালমানুষ। বিদেশ-বিভুঁইয়ে তাঁর দ্বারা তখন তো কোন উপকারই হবে না।

শ্রীকান্ত। সাধ্য হলে নিশ্চয়ই করবো। কিন্তু এসব বিষয়ে বাইরের লোক দিয়ে কাজ তো প্রায়ই হয় না, বরং অকাজই বেড়ে যায়।

অভয়া। সে কথা সত্যি। রেঙ্গুনে জাহাজ ভিড়লে আমাদের ফেলে যাবেন না যেন। দেখছেন তো ওঁর শরীর ! আমরা কিন্তু এক-সঙ্গেই নামব।

শ্রীকান্ত। বেশ তো।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রেঙ্গুনের রাজপথ

অদূরে একটি প্যাগোডা দেখা যাইতেছে। পথচারীরা যাতায়াত করিতেছে। ইহাদের মধ্যে বর্ম্মীই প্রধান। মধ্যে মধ্যে দু'এক-জন বাঙালী ও হিন্দুস্থানী পথচারীকেও দেখা যাইতেছে। দুইজন অল্পবয়স্ক বর্ম্মী মহিলা নাচিতেছিল। কয়েকজন পথচারী তাহাদের ঘিরিয়া নৃত্য উপভোগ করিতেছিল। নাচ যখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, ইহারই মাঝে শ্রীকান্তকে প্রবেশ করিতে দেখা যায়। যে বর্ম্মী মহিলা দুটি এতক্ষণ নাচিতেছিল তাহারা কিছু রোজগার করিয়া নাচিতে নাচিতে অন্যদিকে চলিয়া গেল। যাহারা ভীড় করিয়াছিল তাহারাও ইতস্ততঃ চলিয়া গেল। তরিতরকারী হাতে জনৈক প্রৌঢ় ব্যক্তি এই দলে এতক্ষণ নাচ দেখিতেছিলেন, তিনিও চলিয়া যাইতেছিলেন, সহসা শ্রীকান্তের ডাকে তিনি ফিরিলেন।

শ্রীকান্ত। ও মশাই, শুনছেন?

হরিপদ। আমাকে ডাকছেন?

শ্রীকান্ত। আজ্ঞে হ্যাঁ, দেখে মনে হচ্ছে আপনি এদেশে অনেকদিন আছেন?

হরিপদ। আপনি ঠিকই অনুমান ক'রেছেন। তা হ'ল বছর চল্লিশ। আপনি?

শ্রীকান্ত। আমি সম্প্রতি এসেছি।

হরিপদ। কোথায় থাকা হয়?

শ্রীকান্ত। নিজের থাকার ব্যবস্থা এখনও ঠিক করে উঠতে পারিনি। আমার সঙ্গে একই জাহাজে অপর এক বাঙালী ভদ্রলোক ও

ভদ্রমহিলা রেঙ্গুনে এসেছেন। তাঁদের বাসাটাসা ঠিক ক'রে দেওয়ার ব্যাপারেই একদিন কেটে গেল—

হরিপদ। ওঃ! তাদের স্থিতি ক'রে দিয়ে এখন নিজে স্থিতি হবার চেষ্টা করছেন? তা চাক্‌রী-বাক্‌রী কিছু পেয়ে বুঝি এদেশে এসেছেন?

শ্রীকান্ত। আজ্ঞে না। পাবার আশায় এসেছি। আচ্ছা, আপনি নন্দ মিস্ত্রীর বাসাটা কোথায় বলে দিতে পারেন?

হরিপদ। কোন্ নন্দ? রিপিট্ ঘরের নন্দ পাগড়ীকে খুঁজছেন কি?

শ্রীকান্ত। তা তো জানিনে মশাই কোন্ ঘরের তিনি? তবে জাহাজেই তাঁর সঙ্গে পরিচয়। তিনি বলেছিলেন, রেঙ্গুনের বিখ্যাত নন্দ মিস্ত্রী বল্‌লেই—

হরিপদ। ওঃ! মিস্ত্রী! অমন সবাই নিজেকে মিস্ত্রী কবলায় মশায়, মিস্ত্রী হওয়া সহজ নয়? মরকট্ সাহেব তখন আমাকে বলেছিল—হরিপদ এবার তুমি ছাড়া মিস্ত্রী হবার লোক তো আর দেখতে পাইনে। তখন এই নিয়ে বড় সাহেবের কাছে কত উড়ো চিঠি পড়েছিল জানেন? একশোখানা। আরে, কাস্তের জোর থাক্‌লে কি উড়োচিঠির কর্ম্ম? কেটে দে জোড়া দিতে পারি। তবে কি জানেন মশায়—

শ্রীকান্ত। (বাধা দিয়া) তাহ'লে নন্দ বলে কোন লোককে আপনি জানেন না?

হরিপদ। শোন কথা, চল্লিশ বছর আমার রেঙ্গুনে বাস। আমি জানি না আবার কাকে? নন্দ কি একটা—তিন তিনটে নন্দ আছে যে! (চিন্তা করিয়া) নন্দ মিস্ত্রী বললেন? আসছেন কোথা থেকে? বাঙলাদেশ থেকে? ও! তাই বলুন, টগরের মানুষকে খুঁজছেন?

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তিনিই বটে।

হরিপদ। তাই বলুন। পরিচয় না পেলে চিনব কি ক'রে? বরাতে

ক'রে খাচ্ছে ম'শায়, বরাতে ক'রে খাচ্ছে। নইলে নন্দ পাগড়ী সে নাকি আবার একটা মিস্ত্রী! তা আপনারা?

শ্রীকান্ত। আজ্ঞে ব্রাহ্মণ।

হরিপদ। ব্রাহ্মণ! প্রণাম হই, প্রণাম হই। (পায়ের ধুলা লইল)। নন্দ আপনাকে চাকরী ক'রে দেবে বলেছে বুঝি?

শ্রীকান্ত। আজ্ঞে না।

হরিপদ। তা সাহেবকে বলে কয়ে দিতেও পারে একটা যোগাড় করে। কিন্তু দু'টি মাসের মাইনে আগাম ঘুস্ দিতে হবে, পারবেন? তাহ'লে আঠারো আনা কি পাঁচ-সিকে রোজ ধরতে পারে, এর বেশী নয়।

শ্রীকান্ত। আজ্ঞে চাকরীর জন্যে তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাইছি না। নন্দ মিস্ত্রী আমায় জাহাজে বলেছিলেন, যদি দরকার হয় একটু আশ্রয় যোগাড় ক'রে দেবেন।

হরিপদ। আপনি ভদ্রলোক! নন্দ পাগড়ীর আস্তানায় যেতে যাবেন কেন? তার চেয়ে চলুন ঐ দাদাঠাকুরের হোটেলে। চান করে, সেবা ক'রে, লম্বা একটা ঘুম দিয়ে বিশ্রাম করুন। তারপর বেলা পড়লে তখন একটা ভদ্রলোক দেখে মেস্-টেস্ দেখা যাবে, চলুন।

(হরিপদ মিস্ত্রী একপ্রকার জোর করিয়া শ্রীকান্তকে হোটেলে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিল। ইতিমধ্যে সহসা অপর দিক হইতে নন্দ মিস্ত্রী আসিয়া পড়িল।)

নন্দ। আরে শ্রীকান্তবাবু যে! এসে পর্য্যন্ত তো আপনার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই। কোথায় চলেছেন?

শ্রীকান্ত। অপনারই খোঁজে।

নন্দ। তাই নাকি? (হরিপদকে দেখাইয়া) তা এ মিস্ত্রীর সঙ্গেও জানাশুনা আছে বুঝি?

শ্রীকান্ত। না, তবে এইমাত্র আপনার খোঁজে এসে, হ'লো।

হরিপদ। যাক্‌, তবু ভাল তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। আমি তো বাবুকে বলেছিলাম তুমি কাজে গেছ। আচ্ছা আমি তাহ'লে চলি, নমস্কার।

(হরিপদ চলিয়া গেল। শ্রীকান্ত বলিল)

শ্রীকান্ত। ওঃ! কাল সকাল থেকে আপনাকে কি খোঁজাই না খুঁজছি। শেষে অনেক কষ্টে এঁর কাছে আপনার সন্ধান পেলাম।

নন্দ। কেন? কষ্ট কেন? আমার নাম বল্‌লেই তো চেনবার কথা।

শ্রীকান্ত। আপনার নামই তো ক'রলাম। তা উনি বললেন— মিস্ত্রী বল্‌লে চিনবো কেমন ক'রে, পাগড়ী বলুন।

নন্দ। বল্‌লে বুঝি? জানেন মশাই, হিংসেয় সব মরে যায়। তা যাক্‌ বাসাটাসা কোথায় ঠিক করলেন।

শ্রীকান্ত। কিছুই ঠিক করতে পারিনি। সেইজন্তেই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

নন্দ। ওর জন্তে আপনি কিছু ভাববেন না। ও-সব আমি ঠিক করে দেবো। দাদাঠাকুরের হোটেলে নিয়ে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ হ্যাঁ, উনিও ঐ দাদাঠাকুরের হোটেলের কথা বল্‌ছিলেন বটে।

নন্দ। বলছিল বুঝি? কিন্তু ওর কথার কি কোন ওয়েট্‌ আছে? আমি বলে দিলে আপনাকে ধারে খাওয়াবে।

শ্রীকান্ত। বলেন কি! ধারে খাওয়াবে?

নন্দ। নিশ্চয়ই।

শ্রীকান্ত। এমন হোটেল পাওয়া যাবে?

নন্দ। খুব খুব। কটা চান? বর্ম্মা মুলুকে এ-রকম সুবিধে না থাক্‌লে বাঙালীর ছেলেদের যে কি অবস্থা হোত—তাই ভাবি মশায়। ট্যাঁক খালি না থাকলে, কেউ কি আর চাকরীর আশায় বর্ম্মা মুল্লুকে ছুটে আসে? তা যাক, কাজ কর্ম্ম কিছু সন্ধান পেলেন?

শ্রীকান্ত। আজ্ঞে হ্যাঁ, একটা বড় কাঠের আফিসে একজন কেরানীর চাকরী খালি আছে। সেখানে একটা দরখাস্ত দিযে এসেছি। সাহেব বলেছেন, কাল দেখা করতে, এখন আমার অদৃষ্ট।

নন্দ। ওর জন্যে ভাববেন না মশায়, অদৃষ্টে ঠিক লেগে যাবে। বর্ম্মা মুল্লুকে চাকৃরীর ব্যাপারে বাঙালীর ছেলের খুব নাম। নইলে আমাদের মত লোক ক'রে-কম্মে খাচ্ছে, বুঝছেন না? চলুন চলুন, সব ঠিক্ হ'য়ে যাবে। কিচ্ছু ভাবতে হবে না। আগে আপনার থাকবার ব্যবস্থা করে দিই।　　　　[নন্দ শ্রীকান্তকে লইয়া চলিয়া গেল

তৃতীয় দৃশ্য

রেঙ্গুনে অভয়ার বাসাবাড়ী

রোহিণী তখন সবেমাত্র অফিস হইতে ফিরিয়াছে। ঘরে প্রবেশ করিয়া সে গায়ের জামা খুলিতেছিল এমন সময় খাবারের থালা ও জলের গ্লাস লইয়া অভয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

অভয়া। কি? আজ রেলের অপিসে যেতে সময় পেয়েছিলে?

রোহিণী। না? সন্ধানের জন্যে চিঠি তো দেওয়া হয়েছে, শুধু শুধু ওখানে গিয়ে আর কি হবে?

অভয়া। কি বলছো তুমি? আমার এই কাজটা হ'লো কিনা শুধু শুধু? তবে বাংলা দেশ থেকে এত দূরে এলাম কিসের জন্যে?

রোহিণী। আহা! সেজন্যে চেষ্টা তো করছি। তা অত তাড়া দিলে কি হবে?

অভয়া। তাড়া যে কেন দিচ্ছি তা তুমি বুঝতে পারবে না রোহিণী'দা। যে বয়সে মেয়েমানুষ এক বাড়ীর বাইরে পা দিলে কলঙ্ক রটে, সেই বয়সে আমি সব-কিছু তুচ্ছ ক'রে, কেবল স্বামীকে ফিরে পাবার আশায এতদূরে ছুটে এসেছি।

রোহিণী। বেশ তো, তুমি তোমার স্বামীর সন্ধান পেলেই তার কাছে চলে যেও। আমি কে? গ্রাম-সম্পর্কে দাদা বইতো নয়?

অভয়া। অভিমান কোরো না রোহিণী'দা। এক বাড়ীতে বাস করার ফলে, পাছে কলঙ্ক রটে সেই ভয়ে আমি—

রোহিণী। তুমি কি মনে করো অভয়া, সে কলঙ্ক রটতে এখনো বাকী আছে? কিন্তু তোমার স্বামীকে যদি খুঁজে পাওয়া না যায়, আমি কি করতে পারি বলো? তোমার স্বামীকে খুঁজে বার করবার জন্যে আমি তো আর চাকরী-বাকরী ছেড়ে, সারাদিন পথে পথে ঘুরে বেড়াতে পারিনে।

অভয়া। ঠিকই তো। এসেই চাকরী-বাকরী জুটিয়ে নিয়েছ, দিব্যি আরামে আছ। আমার জন্যে তুমি অত করতে যাবে কেন?

রোহিণী। আরামে আছি? কি আরামেই যে আছি সে ঈশ্বরই জানেন। দেশ-ঘর, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সব-কিছু ছেড়ে, শুধু তোমারই জন্যে আমি দিনরাত পরিশ্রম কোরছি—আর তুমি কিনা শেষে এত বড় কথাটা বললে? বেশ, আরামের আর দরকার নেই। আমি কষ্ট করেই থাকব, নিয়ে যাও সব, আমি চাইনে, চাইনে খেতে। কষ্ট

কোরতে যখন এসেছি, তখন কষ্টই আমি কোরব। চাকরী কোরব, আর দিনরাত ছেলে পড়াব।

(দেখা গেল রোহিণী সবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অভয়া নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অপর দিক দিয়া শ্রীকান্ত ঘরে প্রবেশ করিল—শ্রীকান্তকে দেখিয়া অভয়া আত্ম-সংবরণ করিয়া বলিল)

অভয়া। নমস্কার, এই যে আসুন, ভাল আছেন? বসুন, এতদিন পরে বুঝি গরীবদের মনে পড়লো?

শ্রীকান্ত। কাজ-কর্ম্ম ক'রে কিছুতেই আর সময় ক'রে উঠতে পারছি না।

অভয়া। ওঃ! চাকরী পেয়েছেন বুঝি?

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ, একটা কাঠের আফিসে চাকরী পেয়েছি। আর বড় সাহেবের দয়ায় সে চাকরীতে একটু পদমর্য্যাদাও হোয়েছে।

অভয়া। যাক্, শুনে খুব খুশী হলুম। বড় আশা ক'রে দেশ থেকে এসেছিলেন—

শ্রীকান্ত। তারপর আপনাদের কি খবর বলুন, স্বামীর কোন খবর পেলেন?

অভয়া। না। রেল-অফিসে আগে যেখানে তিনি চাকরী করতেন সন্ধানের জন্য সেখানে একটা দরখাস্ত পাঠিয়েছি, কিন্তু এখনও তার কোন উত্তর পাইনি।

শ্রীকান্ত। যাক্ তবু মন্দের ভাল যে, রোহিণীবাবু এখানে এসেই একটা চাকরী জুটিয়ে নিয়েছিলেন।

(শ্রীকান্তর উপরোক্ত কথার মাঝে রোহিণী ঝড়ের ন্যায় ঘরে প্রবেশ করিয়া বলে)

রোহিণী। না না শ্রীকান্তবাবু, ঐ চাকরী জুটিয়ে নেওয়াটাই ত হ'য়েছে আমার অপরাধ। চাকরী যোগাড় না ক'রে, আগে ওর

স্বামীর অনুসন্ধান করাটাই আমার উচিত ছিল। যাক্, এখানে আমার আপনার জন কে আছে যে, ক্ষিধে পেলে খেতে দেবে? আরাম কোরতে তো এখানে আসিনি শ্রীকান্তবাবু, দুঃখ কোরতে এসেছি, তাই এই শুধু জল খেয়েই কোন রকমে পেট্টা ভরাতে হচ্ছে।

(টেবিলের উপরিস্থিত জলের গ্লাসটি তুলিয়া লইয়া রোহিণী নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাহা পান করিল ও ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার উদ্যোগ করিল—)

অভয়া। (সহাস্যে) ক্ষিধে পেলে কিন্তু জলের গ্লাসের চেয়ে খাবারের থালাটাই মানুষের আগে চোখে পড়ে।

রোহিণী। আচ্ছা শ্রীকান্তবাবু, আপনি যেখানে থাকেন সেখানে আমার একটু বন্দোবস্ত ক'রে দিতে পারেন?

শ্রীকান্ত। তা হয়তো পারি। কিন্তু সেখানে তো লুচি-মোহনভোগ হয় না।

রোহিণী। দরকার কি? ক্ষিধের সময় কেউ যদি একটু গুড় দিয়ে জল দেয়, তাহ'লে সেই যে অমৃত। এখানে তাই বা দেয় কে?

শ্রীকান্ত। (অভয়ার প্রতি) ব্যাপার কি বলুন তো? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

অভয়া। ব্যাপার আর কি? আমি এসেছি এই বিদেশে বিভুঁইয়ে শূন্যহাতে, স্বামীর সন্ধান কোরতে, আর উনি এখানে এসে আমার জন্যে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করছেন। ওঁর সেবা-যত্নের দিকে নজর দিতে পারছি না। অথচ গলগ্রহের মতো ওঁরই অন্ন দু'বেলা ধ্বংসাচ্ছি—

রোহিণী। তুমি গলগ্রহ একথা আমি বলেছি?

অভয়া। বোলবে কেন? দেখাচ্ছ, হাজার রকম দেখাচ্ছ।

রোহিণী। দেখাচ্ছি? শ্রীকান্তবাবু, কথাগুলো একবার শুনে রাখুন—

অভয়া। (সক্রোধে) তুমি দেশে ফিরে যাও। আমার জন্যে কেন তুমি এত কষ্ট সইবে? তোমার আমি কে? এত খোঁটা দেওয়ার চেয়ে—

রোহিণী। (চীৎকার করিয়া) শুনুন শ্রীকান্তবাবু, হু'টো রেঁধে দেওয়ার জন্যে, কথাগুলো আপনি শুনে রাখুন। আচ্ছা, আজ থেকে তুমি যদি আমার জন্যে রান্না-ঘরে যাও তো তোমার অতি বড়—আমি বরঞ্চ হোটেলে—

(রোহিণী কোঁচার খুঁট মুখে চাপা দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল)

শ্রীকান্ত। (ইতঃস্ততঃ করিয়া) দেখুন, আমাকে অনেকদূর যেতে হবে, এখন তাহ'লে আসি—

অভয়া। আবার কবে আসবেন?

শ্রীকান্ত। নিশ্চয় করে বোলতে পাচ্ছি না। অনেকদূরে থাকি তো—

অভয়া। রোহিণীদার ব্যাপার দেখে, আপনার মনে যে আজ কি ধারণা হ'লো, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু বিপদে আপনার ওপর যে কতখানি নির্ভর করে আছি সেও আপনি জানেন। কি আর বলবো—এ অভাগিনী বোনটিকে যেন পায়ে ঠেলবেন না।

(সহসা রোহিণী একটি সদ্য ছেঁড়া খাম ও চিঠি লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল)

রোহিণী। এই নাও, বর্ম্মা রেল কোম্পানীর চিঠি। লেটার বক্সে এসে পড়েছিল। তোমার স্বামীর প্রায় দুবছর আগে কোন গুরুতর অপরাধের জন্যে রেল কোম্পানীর চাকরী চলে গিয়েছে। কাজেই এখন আর কোম্পানী তোমার স্বামীর কোন খবর বলতে পারে না। আমার কথা বিশ্বাস না হয়, চিঠিটা শ্রীকান্তবাবুকে দিয়েও পড়িয়ে নিতে পারো—

(চিঠিটা অভয়ার হাতে দিয়া প্রস্থানোদ্যত)

শ্রীকান্ত। (বাধা দিয়া) সে কি কথা! আপনি পড়ে বল্‌ছেন, এর ওপর —

রোহিণী। না না, চিঠিটা দুজনেরই পড়ে দেখা দরকার।

[প্রস্থান

অভয়া। চিঠিটা আপনার কাছেই রেখে দিন, শ্রীকান্তবাবু। ও থেকে কিছু আর হোক না হোক, আমার স্বামীর নামটা তো জানতে পারবেন। রেঙ্গুনের প্রবাসী বাঙালীদের কাছে ঐ নামে খোঁজ করলে কোনদিন না কোনদিন হয়তো তাঁর সন্ধানও মিলে যেতে পারে।

(অভয়া শ্রীকান্তকে চিঠিটা দিল। শ্রীকান্ত চিঠিটা পকেটে রাখিল অভয়া জিজ্ঞাসা করিল)

অভয়া। এখন আপনি কি উপদেশ দেন?

শ্রীকান্ত। আমি কি উপদেশ দেবো?

অভয়া। না, সে হবে না। এ অবস্থায় আপনাকেই কর্ত্তব্য স্থির ক'রে দিতে হবে।

শ্রীকান্ত। বাড়ী ফিরে যাওয়া সম্বন্ধে আপনার মত কি?

অভয়া। কিছুই না, বলেন যেতে পারি। কিন্তু আমার তো সেখানে কেউ নেই—

শ্রীকান্ত। কিন্তু রোহিণীবাবু কি বরাবরই আপনার ভার নিতে পারবেন?

অভয়া। পরের মনের কথা কি ক'রে জানবো বলুন? তাছাড়া তিনি নিজেই বা জানবেন কি করে? একটা কথা আপনাকে বলি, আমার জন্যে তিনি কিন্তু একবিন্দুও দায়ী নন। দোষ বলুন, ভুল বলুন, সমস্তই একা আমার।

শ্রীকান্ত। আচ্ছা ধরুন, যদি আপনার স্বামীর সন্ধান পাওয়া যায় এবং আপনি যদি দেখেন, আপনার স্বামী একটি বর্ম্মী মেয়ে বিয়ে ক'রে ঘর-সংসার পেতে বসে আছেন, তা হ'লেও কি আপনি—

অভয়া। হ্যাঁ, তিনি যদি আশ্রয় দেন, তাহলেও আমি তাঁর কাছে থাকতে রাজী আছি।

শ্রীকান্ত। কিন্তু বর্ম্মী মেয়েদের যে কি রকম স্বভাব তাতো এ কদিন আপনি চোখেও দেখছেন আর কানেও শুনছেন, তা সত্ত্বেও আপনি স্বামীর ঘর করবেন?

অভয়া। না ক'রে আমার উপায় কি বলুন?—

(আঁচলে চোখ মুছিতে লাগিল)

শ্রীকান্ত। আচ্ছা, আসি তাহ'লে—

(অভয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া বলিল)

অভয়া। ছোট বোনের কথা ভুলে যাবেন না যেন। আমি এক সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসে, আর এক সমুদ্রে এসে পড়েছি।

(কাঁদিতে লাগিল)

শ্রীকান্ত। আমিও ঠিক সেই কথাই ভাবছি বোন, তোমার জীবন-তরণী এবার কোন্ কিনারায় গিয়ে নোঙর কোরবে? আচ্ছা আসি।

(শ্রীকান্ত চলিয়া যায়। অভয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চেয়ারে বসিয়া পড়িল। মাথাটি টেবিলের উপর রাখিয়া ফুঁপাইতে লাগিল, রোহিণী অন্যদিক দিয়া প্রবেশ করিয়া বলিল—)

রোহিণী। শ্রীকান্তবাবু চলে গেলেন?

অভয়া। (চোখের জল মুছিতে মুছিতে) হ্যাঁ!

রোহিণী। এ কি! তুমি কাঁদছিলে নাকি?

অভয়া। শ্রীকান্তবাবুর সামনে আজ কি কাণ্ডটা কোরলে বল দেখি? ছিঃ ছিঃ! জানি না আমাদের সম্বন্ধে উনি কি ধারণা নিয়ে গেলেন—

রোহিণী। গ্রাম থেকে চলে আসার পর, গ্রামের লোকেরা আমাদের সম্বন্ধে যে ধারণা ক'রে রেখেছে—আশা করি, তার চেয়ে শ্রীকান্তবাবুর ধারণাটা খুব বেশী খারাপ হবে না।

অভয়া। তা হয়তো হবে না। কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে এ যে কতোখানি লজ্জা, কতোখানি ক্ষতিকর, তা তোমায় আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না।

রোহিণী। তার আর প্রয়োজনও নেই অভয়া। ভুলে যেও না—নীড়-হারা বিহঙ্গ নূতন ক'রে যে নীড় রচনা করে, তাকে আশ্রয় ক'রেই তাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখ রচিত হয়—

অভয়া। তা হয়তো হয়। কিন্তু আমি ভাবছি—যে উদ্দেশ্যে নীড়-হারা হ'য়ে এতদূরে ছুটে এলাম, সে উদ্দেশ্যে যদি সফল না হয়, তাহ'লে—

রোহিণী। তাহলে কি অভয়া?

অভয়া। না না, যে কথা আমি তোমায় বলতে পারবো না—সে কথা তুমি আমায় জিজ্ঞাসা ক'রো না—জিজ্ঞাসা ক'রো না—

(অভয়া ঘর হইতে ছুটিয়া চলিয়া গেল)

চতুর্থ দৃশ্য

শ্রীকান্তের অফিসের কক্ষ

শ্রীকান্ত একাকী বসিয়া অফিসের কাজকর্ম্ম করিতেছিল। আফিসের একজন বেয়ারা আসিয়া শ্রীকান্তকে একটুকরা নাম-লেখা কাগজ দিল। শ্রীকান্ত তাহা পড়িয়া নিজের পকেট হইতে অভয়ার দেওয়া খামখানি বাহির করিয়া কি যেন মিলাইয়া দেখিল, তাহার পর বেয়ারাকে কহিল।

শ্রীকান্ত। বাবুকে পাঠিয়ে দাও—

(বেয়ারা সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। শ্রীকান্ত পুনরায় কাজে মনোনিবেশ করিল। ইতিমধ্যে জনৈক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করিল। লোকটির পরণে প্যাণ্ট কোট। কিন্তু তাহা যেমন নোংরা—তেমনি পুরানো। সমস্ত কালো মুখখানা গোঁফ দাঁড়িতে সমাচ্ছন্ন। নীচেকার ঠোঁট্টা দেড় ইঞ্চি পুরু। তাহার উপর এত পান খাইয়াছে যে, পানের রস দুই কসে যেন জমাট বাঁধিয়া আছে। লোকটি ঘরে আসিয়া বলিল)

অভয়ার স্বামী। Good afternoon Sir.

শ্রীকান্ত। Good afternoon! বসুন, আপনি কি প্রোম আফিস থেকে আসছেন?

অভয়ার স্বামী। আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি ঠিক ধরেছেন।

শ্রীকান্ত। আমাদের প্রোম Branch office-এর সাহেব আপনার বিরুদ্ধে যে নালিশ করেছেন, তা কি সত্যি?

অভয়ার স্বামী। আপনি বাঙালী, স্বজাতি। আপনার কাছে মিথ্যে বোলব না। আমি স্যার একবারে নির্দ্দোষ। আমি আছি বলে, প্রোম

আফিসের সাহেব দু'হাতে টাকা লুঠ কোরতে পারছেন না, তাই আমার ওপর তাঁর এই আক্রোশ। সাহেবের মতলব আমাকে ওখান থেকে সরিয়ে ঐ জায়গায় একজন নিজের লোক নেয়। তাহ'লেই বুঝলেন স্যার, দুহাতে লুঠ করবার সুবিধেটা হয়, আমার চাকরীটা যাতে যায়। সেই মতলবে আমার against-এ মিথ্যে মিথ্যে এই সব complain কোরেছে।

শ্রীকান্ত। তা এ চাকরী গেলেই বা আপনার বিশেষ ক্ষতি কি? রেলের চাকরী গেলে কদিনই বা আপনাকে বসে থাকতে হয়েছিল!

অভয়ার স্বামী। (থতমত খাইয়া) তা যা বলেছেন। কিন্তু কি জানেন মশাই family man অনেকগুলো কাচ্চা-বাচ্চা—

শ্রীকান্ত। আপনি কি বর্ম্মী মেয়ে বিয়ে করেছেন নাকি?

অঃ স্বামী। (উত্তেজিতভাবে) সাহেব ব্যাটা রিপোর্টে তাই লিখেছে বুঝি? এই থেকেই বুঝতে পারবেন স্যার, শালার রাগ। আচ্ছা, আপনি বিশ্বাস করেন?

শ্রীকান্ত। বর্ম্মী মেয়েই যদি বিয়ে করে থাকেন, তাতেই বা দোষ কি?

অঃ স্বামী। (উৎসাহিতভাবে) আমিও ঠিক সব্বাইকে ওই কথাই বলি স্যার। যা কোরবো তা boldly স্বীকার কোরবো। তা ছাড়া পুরুষমানুষ, বুঝলেন না? দেশে-ঘরে আমার কেউ কোথাও নেই, আর চিরকাল এইখানে আমার চাকরী করে খেতে হবে, তাই বুঝলেন না মশাই?

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ তাতো বটেই। তা আপনার দেশে কি কেউই নেই?

অঃ স্বামী। আজ্ঞে কেউ কোথাও নেই, কাকস্য পরিবেদনা।

শ্রীকান্ত। আচ্ছা আপনি অভয়াকে চেনেন?

অঃ স্বামী। (বিস্মিতভাবে) অভয়া? তাকে আপনি জানলেন কেমন করে?

শ্রীকান্ত। ধরুন এমনও তো হতে পারে যে, সে আপনার খোঁজ নিয়ে খাওয়া-পরার জন্যে এই আফিসে দরখাস্ত করেছে।

অঃ স্বামী। ওঃ! তাই বলুন, স্বীকার করছি একসময়ে সে আমার স্ত্রী ছিল।

শ্রীকান্ত। এখন?

অঃ স্বামী। কেউ নয়— মানে তাকে ত্যাগ করে এসেছি।

শ্রীকান্ত। ত্যাগ করেছেন! তার অপরাধ?

অঃ স্বামী। কি জানেন family secret, বলা উচিত নয়। কিন্তু আপনি যখন আমার আত্মীয়ের সামিল, তখন বলতে লজ্জা নেই যে, সে একটা নষ্ট স্ত্রীলোক, তাই তো মনের ঘেন্নায় দেশত্যাগী হ'লাম স্যার। নইলে সাধ করে কেউ কি কখনো এমন দেশে পা দেয়? আপনিই বলুন না, এ কি সোজা মনের ঘেন্না?

শ্রীকান্ত। কিন্তু তাঁর এই অপরাধের কথা আপনি তো আসবার সময় তাঁকে বলে আসেননি। এখানে এসে কিছুদিন যখন চিঠি-পত্র লিখেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে টাকাকড়ি পাঠিয়েছিলেন, তখনও তো এ-সব কথা লিখে জানাননি?

অঃ স্বামী। (হাসিয়া) এই নিন কথা, জানেন তো মশায়, আমরা ভদ্রলোক। ছোটলোকের মত নিজের স্ত্রীর কলঙ্ক তো আর ঢাক পিটিয়ে প্রচার করতে পারি না। থাক গে সে-সব দুঃখের কথা ছেড়ে দিন মশায়! এ-সব মেয়েমানুষের নাম মুখে আনলেও পাপ হয়। তা হ'লে কেস্‌টা তো আপনিই ডিসপোজ করবেন? আচ্ছা, আমি বলি কি হারামজাদাকে হেড অফিসে টেনে আনা যায় না?

শ্রীকান্ত। না, তা যায় না।

অঃ স্বামী। কি যে বলেন স্যার। আপনি ইচ্ছা করলে নিশ্চয়ই আনা যায়। বড় সাহেব একেবারে আপনার মুঠোর মধ্যে, সে খবর কি আমি না নিয়ে আসছি ভাবেন! আচ্ছা বড় সাহেবের অর্ডারটা আজই বার ক'রে আমার হাতে দিতে পারা যায় না? তা হলে ন-টার গাড়ীতে আমি গ্রামে ফিরে যেতুম। রাত্তিরটা আর এখানে পড়ে থেকে কষ্ট পেতে হ'ত না।

শ্রীকান্ত। শুনুন, বড় সাহেবের হুকুম আপনার হাতে নিয়ে লাভ নেই।

অঃ স্বামী। কেন?

শ্রীকান্ত। আপনি আর কোথাও চাকরীর চেষ্টা দেখুন।

অঃ স্বামী। (সভয়ে) তার মানে?

শ্রীকান্ত। তার মানে আপনাকে ডিসমিস্ করার নোটিশ আমি দেবো।

অঃ স্বামী। বাঙালী হয়ে বাঙালীকে মারবেন না স্যার, ছেলে-পিলে নিয়ে তাহলে আমি মারা যাব।

শ্রীকান্ত। সে দেখবার ভার আমার ওপরে নেই।

(শ্রীকান্তর কথা শুনিয়া অভয়ার স্বামী চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং শ্রীকান্তকে দুই হাতে ধরিয়া অনুনয় করিয়া বলিতে লাগিল)

অঃ স্বামী। আপনি দয়া না করলে আমি মরে যাব। চাকরীটা যাতে বজায় থাকে এ আপনাকে করতেই হবে। নইলে আপনার পায়ের তলায় আমি মাথা খুঁড়ে মরব।

(কথাগুলি শেষ করিয়াই অভয়ার স্বামী শ্রীকান্তর পায়ে মাথা খুঁড়িবায় উদ্যোগ করিল। শ্রীকান্ত বাধা দিয়া বলিল)

শ্রীকান্ত। আরে মশাই, করেন কি, করেন কি! এটা অফিস। উঠুন, উঠুন।

(শ্রীকান্ত কোনরকমে অভয়ার স্বামীকে প্রকৃতিস্থ করাইয়া চেয়ারে বসাইল পরে বলিল)

শ্রীকান্ত। অভয়া আপনার জন্মে বর্ম্মায় এসেছে। আপনি তা জানেন ?

অঃ স্বামী। কই, আমি তো কিছুই জানিনে।

শ্রীকান্ত। জানবেন কি করে ? ছ'বছরের ওপর আপনি তার কোন খোঁজ-খবর নেননি। তাই তিনি বাঙলাদেশ থেকে আপনার খোঁজে এতদূরে ছুটে এসেছেন। একই জাহাজে আমরা আসি। রেঙ্গুনে পৌছেই আপনার যথেষ্ট খোঁজ-খবর করা হয়েছিল। কিন্তু আপনার পাত্তা কোরতে না পেরে শেষে বর্ম্মা রেলওয়ে আফিসে আপনার নামে চিঠি দেওয়া হয়। এই দেখুন, সেই চিঠির উত্তর, চিঠির নামের সঙ্গে আপনার নামের মিল দেখে আমি আন্দাজে ধরেছিলাম—আপনি অভয়ার স্বামী। যাক, আপনার দুশ্চরিত্রা স্ত্রীকে আমি অবশ্য নিতে বলিনে, কিন্তু আপনার সমস্ত কথা শুনেও যদি সে আপনাকে মাফ করে, তাহলে আমি আপনার চাকরীটা বজায় রাখার চেষ্টা করব। না হলে, আপনি আর আমার সঙ্গে দেখা করে লজ্জা দেবেন না। এই নিন তার ঠিকানা, যদি ইচ্ছা হয় তার সঙ্গে দেখা কোরতে পারেন।

(শ্রীকান্ত একটুকরা কাগজে অভয়ার ঠিকানা লিখিয়া অভয়ার স্বামীকে দিল)

অঃ স্বামী। (ঠিকানাটা লইয়া) ইচ্ছা হয় কি বলছেন স্যার! দেখা করা এতো আমার কর্ত্তব্য। নারায়ণ সাক্ষী করে যাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছি। তাকে কি ফেলতে পারি ? দূরে যখন ছিল সে-কথা আলাদা। তাই বলে, এখন কি আর তাকে এইভাবে ফেলে রাখতে পারি ? Out of sight out of mind, আমি আজই তার সঙ্গে দেখা করে, তাকে প্রোমে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা কোরবো।

শ্রীকান্ত। প্রোমে নিয়ে গিয়ে রাখবেন কোথায়? আপনার সেই বর্ম্মী স্ত্রীর সঙ্গে বাস করা কি তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে?

অঃ স্বামী। না না, একসঙ্গে রাখব কেন? হাজার হোক সতী-লক্ষ্মী এই বর্ম্মাদেশের মেয়ের সঙ্গে কি বাস করতে পারে?

শ্রীকান্ত। সতীলক্ষ্মী! একটু আগেই যে বললেন দুশ্চরিত্রা?

অঃ স্বামী। না স্যার, লজ্জায় ও একটা মিথ্যে অপবাদ তার নামে দিয়েছিলাম—মাফ কোরবেন। অভয়াকে আমি চিরকালই প্রাণের চেয়ে ভালোবাসি। তবে কি জানেন স্যার, accident. এখানে এসে আবার একটা উপসর্গ জুটে গেল—

শ্রীকান্ত। উপসর্গ?

অঃ স্বামী। উপমা ছাড়া আর কি, আর বর্ম্মীদের ভয়ে প্রাণ বাঁচানর জন্যে তাকে কাছে রাখতে হয়েছে। উপস্থিত অভয়াকে পোষ্টমাষ্টারে মশায়ের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রাখব। তিনিও বাঙালী অতিশয় ভদ্রলোক। তারপর ঐ বর্ম্মী স্ত্রীকে তাড়িয়ে সতীলক্ষ্মীকে আবার স্বর্ণ-সিংহাসনে বসাব।

শ্রীকান্ত। থাক্। আর স্বর্ণ-সিংহাসনে বসিয়ে কাজ নেই। আপনার চরণকমলে একটু স্থান দেবেন, তাহলেই হবে। তা যাক, অভয়াকে কি আজই নিয়ে যাবেন?

অভয়ার স্বামী। (সবিস্ময়ে) বিলক্ষণ! যতদিন চোখে দেখিনি ততদিন না হয় কোনরকমে ছিলাম। কিন্তু আজ চোখে দেখার পর আর কি তাকে ফেলে রেখে যেতে পারি? আহা! একলা এতদূরে এত কষ্ট সয়ে, শুধু সে আমার জন্যেই এসেছে।

শ্রীকান্ত। তা হলে আপনাকে যে ঠিকানা দিলাম ঐ ঠিকানায় গিয়ে অভয়ার সঙ্গে দেখা করে তাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন। আমিও বড় সাহেবের কাছ থেকে অর্ডারটা বার করে পোষ্টে প্রোমে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি।

অঃ স্বামী। যে আজ্ঞে, তাহলে এখন আমি উঠি।

শ্রীকান্ত। আসুন।

(অভয়ার স্বামী যাইতে যাইতে পুনরায় ফিরিয়া কহিল)

অঃ স্বামী। অর্ডারটা telegram করে না পাঠালে স্যার, কাল সাড়ে দশটার ভেতরে তো আফিসে-এ পৌছবে না। আর তা না পৌছুলে, আমিও তো আফিসে বসতে পারবো না।

শ্রীকান্ত। আচ্ছা আমি telegram কোরেই না হয় পাঠাব।

অঃ স্বামী। কর্ম্মজীবন আর পারিবারিক জীবন দুটোতেই আমি এতোদিন suspended হয়ে ছিলাম স্যার! আজ আপনার দয়ায় আবার দুটো থেকেই আমি উদ্ধার পেলাম। আচ্ছা আসি, নমস্কার।

শ্রীকান্ত। নমস্কার। (অভয়ার স্বামী চলিয়া গেল। শ্রীকান্ত কাজে মনোনিবেশ করিলেন।)

পঞ্চম দৃশ্য

রেঙ্গুন। অভয়ার বাসাবাড়ী

তখন অপরাহ্ণকাল। রোহিণী কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। আফিস হইতে আসিয়া টেবিলের ওপর মাথা রাখিয়া কত কি চিন্তা করিতেছে। এতক্ষণে সে গায়ের জামাটি পর্য্যন্ত খোলে নাই। মেঝের উপর বসিয়া জনৈক বর্ম্মী চাকর টেবিল ল্যাম্প পরিষ্কার করিতেছিল। টেবিলের উপর এক কাপ চা দেখা গেল। রোহিণীকে বেশ কিছুক্ষণ নীরব নিস্তব্ধ দেখিয়া চাকরটি বলিল।

উ-বা। বাবুজী! চা—

(রোহিণীর সাড়া নাই। চাকরটি পুনরায় কহিল)

বাবুজী! চা জুড়িয়ে গেল যে!

(চাকরের ডাকে রোহিণীর চমক ভাঙে ও বলে)

রোহিণী। ও! হ্যাঁ, এই যে—

(রোহিণী চায়ে চুমুক দিল)

(চাকরটির এতক্ষণে আলো পরিষ্কার করা হইয়া গিয়াছে, সে টেবিলের উপর আলো রাখিয়া বলে)

উ-বা। উনুনে অনেকক্ষণ আগে আগুন দিয়ে দিয়েছি। চালও ধুয়ে রেখেছি, জামাটা ছেড়ে, হাত-মুখ ধুয়ে! যা হোক কিছু চাপিয়ে দিন গে বাবু—

রোহিণী। হ্যাঁ, এই যে যাই—

উ-বা। একা আপনার খুবই কষ্ট হচ্ছে।

রোহিণী। না, কষ্ট আর কি? যা হোক দুটো ফুটিয়ে খাওয়া বৈ ত নয়।

উ-বা। তাহ'লে এ-বেলায় কি তরকারী কুটে দেবো বাবু?

রোহিণী। তরকারীর ঝুড়ি আর বঁটিটা এ ঘরে বরং দিয়ে যাও, যা হোক আমি কুটে নোব'খন। তোমায় তো আবার পাঁচ বাড়ীতে কাজ কোরতে যেতে হবে। এমনই তো আজ তোমার দেরী হয়ে গেল—

উ-বা। যাবার সময় মা আমায় বলে গিয়েছিলেন, উ-বা, তুই তোর বাবুকে একাই যত্ন করিস্ বাবা, দেখছিস তো দ্বিতীয় মানুষ নেই।

রোহিণী। ওঃ! যাবার সময় একথা তোমায় বলেছিল বুঝি?

উ-বা। আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রোমের বাবুটি এলেন তাঁকে নিতে, আপনি তখন বাড়ী ছিলেন না। আমাকে বললেন, উ-বা, তুই তোর বাবুকে

একটু বুঝিয়ে বলিস বাবা ! ট্রেনের সময় হয়ে গেছে, এরপর আর গ্রামে যাবার ট্রেন নেই। তাই, তাঁর সঙ্গে দেখা না করেই আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। কথা ক'টা বলেই সে কি কান্না বাবু !

রোহিণী। ও ! আচ্ছা, তুমি তরকারীর ঝুড়িটা এ-ঘরে এনে দিয়ে যাও—

(উ-বা ঘরের বাহির হইয়া গেল। রোহিণী গায়ের জামাটা খুলিয়া আলনায় রাখিল। পুনরায় ধীরে ধীরে চেয়ারে বসিয়া পড়িল। ইতিমধ্যে উ-বা আনাজের ঝুড়ি বঁটি লইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া বলে—)

উ-বা। আলোটা কি জ্বেলে দিয়ে যাব ?

রোহিণী। না, দরকার নেই, নিজেই জ্বেলে নেবো'খন।

(উ-বা চলিয়া গেল, রোহিণী ধীরে ধীরে বঁটির নিকট আসিয়া বসিল এবং একটি বেগুন দু'খানা করিয়া মাথায় হাত দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ক্রমেই সন্ধ্যা হইল। অন্ধকারে সমস্ত ঘরটা ঢাকিয়া গেল। ইতিমধ্যে শ্রীকান্ত ঘরে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—)

শ্রীকান্ত। রোহিণীদা !

রোহিণী। (চম্‌কাইয়া) কে ?

শ্রীকান্ত। আমি শ্রীকান্ত।

(বঁটি কাৎ করিয়া ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল)

রোহিণী। ও ! শ্রীকান্তবাবু !

শ্রীকান্ত। হঠাৎ এসে বিরক্ত কোরলাম না তো ?

রোহিণী। না না, সে কি কথা ! আপনি আসবেন তাতে আর বিরক্ত কি ? বরং আপনাকে ক'দিন দেখতে না পেয়ে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম।

শ্রীকান্ত। তা যাক, করছিলেন কি ?

রোহিণী। এই একটু কুটনো কুটছিলাম।

শ্রীকান্ত। কুটনো কুটছিলেন ? এই অন্ধকারে বসে কুটনো কোটে নাকি ? হাত কেটে যাবে যে ?

রোহিণী। (লজ্জিতভাবে) না এইবার আলোটা জ্বালি। অন্ধকার হ'য়ে গেছে খেয়ালই হয়নি।

(টেবিল ল্যাম্পটি জ্বালিতে লাগিল, শ্রীকান্ত বলিল)

শ্রীকান্ত। অভয়া যখন চলে গেছে, তখন আর এখানে কেন ? চলুন আমার সঙ্গে।

রোহিণী। কেন ?

শ্রীকান্ত। কেন কি ? এখানে যে আপনার কষ্ট হচ্ছে।

রোহিণী। জানেন শ্রীকান্তবাবু, প্রাইভেট টিউসানিটা ছেড়ে দিয়েছি, আফিসের চাকরীর পর টিউসানিটা আর শরীরে পোষাচ্ছিল না। তার ওপর আফিসটাও তো ভাল নয়।

শ্রীকান্ত। সেইজন্তেই তো বলেছিলুম, এখানে আর এভাবে থাকা কেন ?

রোহিণী। আর কিছু তো নয়, এই আফিস থেকে এসে রাঁধা-বাড়া করাটা ভারী বিরক্তিকর। নইলে আর কষ্ট কি ?

শ্রীকান্ত। তাই তো বলছি, চলুন আমার মেসে। দিব্যি একসঙ্গে থাকা যাবে। আসছে মাসের গোড়াতেই আবার আমাকে দিন-কতকের ছুটি নিয়ে একবার বাঙলাদেশে যেতে হবে। এইসময়ে আপনি আমার মেসে গেলে—

রোহিণী। দেশে যাবেন ? কেন ?

শ্রীকান্ত। একটা বিয়ের ব্যাপারে। না গেলেই নয়, এইসময়ে আপনি গেলে সিটটা বেহাত হ'য়ে যেতো না।

রোহিণী। এ মাসটা তো যাক। বাড়ীভাড়া, চাকরের মাইনে, এ-সব তো দিতেই হবে। পরের মাসে যাহোক করা যাবে। আচ্ছা, শ্রীকান্তবাবু! অভয়াকে নিয়ে যাওয়ার পর আপনি আর তার কোন খবর পাননি?

শ্রীকান্ত। আজ্ঞে না। তবে আজ সকালে অভয়ার স্বামীর একটা চিঠি আমি পেয়েছি। আপনি কি অভয়াকে টাকা পাঠিয়েছিলেন?

রোহিণী। আজ্ঞে হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

শ্রীকান্ত। আপনি টাকা পাঠানোর জন্যে অভয়ার স্বামী বিরক্ত হয়েছেন। যাই হোক্, টাকাকড়ি আপনি না পাঠালেই ভাল করতেন। লোকটিকে আপনি দেখেননি, কিন্তু আমি দেখেছি। এক নম্বরের স্কাউন্ড্রেল! না পারে এমন কোন কাজ নেই। এই বলে অভয়া দুশ্চরিত্রা! আবার তখুনি বলে ওর মত সতীলক্ষ্মী আর হয় না!

রোহিণী। তাই নাকি! আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, টাকাটা না পাঠালেই ছিল ভাল। আপনার কি মনে হয়, ওর জন্য অভয়াকে কষ্ট দেবে?

শ্রীকান্ত। তার মত লোকের পক্ষে সেইটেই স্বাভাবিক। বরং কষ্ট না দিলেই আশ্চর্য্য হবো।

রোহিণী। কি সাংঘাতিক লোক বলুন তো?

শ্রীকান্ত। ও আর কি সাংঘাতিক, (সহসা দরজার নিকট অভয়াকে দেখিয়া শ্রীকান্ত বলিল) একি! অভয়া! তুমি?

অভয়া। হ্যাঁ, কেন চলে এলাম এ-কথা জানতে নিশ্চয়ই কৌতূহল হচ্ছে?

(সহসা দক্ষিণ বাহু অনাবৃত করিয়া সে দেখাইল, বেতের দাগ চামড়ার উপর কাটিয়া বসিয়াছে)

অভয়া। এমন অবশ্য আরও অনেক আছে। কিন্তু ফিরে আসা

এই আমার একমাত্র কারণ নয় শ্রীকান্তবাবু। আমার সতীধর্ম্মের এ সামান্য একটু পুরস্কার মাত্র! তিনি যে স্বামী, আর আমি যে তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী, এ তারই একটু চিহ্ন।

রোহিণী। Scoundrel!

অভয়া। আমি যে স্ত্রী হয়ে স্বামীর বিনা অনুমতিতে এতদূর এসে তাঁর শান্তি ভঙ্গ করেছি, মেয়েমানুষের এতদূর স্পর্দ্ধা, পুরুষমানুষে সইতে পারে না। তাই তিনি অনেক রকমে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে কৈফিয়ত চাইলেন, আমি কেন রোহিণীদার সঙ্গে এসেছি? বললুম, স্বামীর ভিটে যে কি সে আমি আজও জানিনে। আমার বাপ নেই, মা মারা গেছেন। দেশে খেতে-পরতে দেয় এমন কেউ নেই। তোমাকে বার বার চিঠি লিখেও জবাব পাইনি,—আমার কথা শুনে একখানা বেত তুলে নিয়ে বললেন—আজ তার জবাব দিচ্ছি।

(প্রহৃত দক্ষিণ বাহুটি বেদনাকাতরভাবে স্পর্শ করিল)

রোহিণী। উঃ! (অব্যক্ত বেদনায় সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল)

শ্রীকান্ত। চলে আসাটা যে অন্যায়, একথা আমি বোলতে পারিনে। কিন্তু—

অভয়া। এই কিন্তুটার বিচারই তো আপনার কাছে চাইছি শ্রীকান্তবাবু! তিনি তাঁর বর্ম্মী স্ত্রী নিয়ে সুখে থাকুন, আমি নালিশ করছিনে—কিন্তু স্বামী যখন শুধু মাত্র একগাছা বেতের জোরে স্ত্রীর সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে, তাকে অন্ধকার রাত্রে একাকী ঘরের বার করে দেন, তার পরেও বিবাহের বৈদিক মন্ত্রের জোরে স্ত্রীর কর্ত্তব্যের দায়িত্ব বজায় থাকে কিনা, আমি সেই কথাটার জবাবই আপনার কাছে জানতে চাইছি।

শ্রীকান্ত। অভয়া! তুমি আমার কাছে যে জবাব প্রত্যাশা করো,

তার ঠিকমত জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সত্যই কঠিন। তবে তোমার মতন আরও দু'টি-একটি দুঃখী মেয়ের ইতিহাস আমি জানি। তোমার চেয়ে তাদের দুঃখ বড় কম নয়। এদের দুঃখের কাহিনী শুনলে, আর কিছু হোক আর না হোক, তোমার মনটা হয়তো খানিকটা হাল্কা হতে পারে।

অভয়া। বেশ বলুন।

শ্রীকান্ত। আমার এক দিদি ছিলেন তাঁর নাম অন্নদা। আমার এই অন্নদাদিদির স্বামী তাঁর নিজের বড় শালীকে অর্থাৎ অন্নদাদিদির মার পেটের বড় বোনকে খুন করে নিরুদ্দেশ হন। বছর-কয়েক পরে নিরুদ্দিষ্ট স্বামীকে তিনি দেখতে পান—সাপুড়ের বেশে। তারপর স্বামীর সেবা-যত্নের জন্মে সকলের অজ্ঞাতসারে তিনি স্বামীর অনুগামিনী হন। ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে, মুসলমানের বেশে, সাপুড়ের আচার ব্যবহারে, তিনি অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করেন। শেষে সাপের কামড়ে একদিন তাঁর স্বামী মারা গেলেন। আর সমাজের চোখে—অন্নদাদিদি চিরদিনই কুলত্যাগিনী হয়ে রইলেন।

অভয়া। (আঁচলে চোখ মুছিয়া) তারপরে ?

শ্রীকান্ত। তারপরে আর জানি না। এইবারে পিয়ারী বাইজীর কথা শোন। তার নাম ছিল যখন রাজলক্ষ্মী তখন থেকে সে একজনকে ভালোবাসতো, কিন্তু জীবন তাদের ভিন্ন পথে গেল। বহুকাল পরে হঠাৎ একদিন এক জমিদারবাবুর প্রমোদবাসরে রাজলক্ষ্মী তার ভালো-বাসার পাত্রটিকে দেখতে পেলো। তখন সে আর রাজলক্ষ্মী নয়—পিয়ারী বাইজী। কিন্তু রাজলক্ষ্মী যে মরেনি, পিয়ারীর মধ্যে চিরদিনের জন্য অমর হয়েছিল—তার ভালবাসার পাত্রটির কাছে সেইদিনই তার প্রমাণ হয়ে গেল।

অভয়া। তারপর ?

শ্রীকান্ত। প্রিয়তমের রোগে, শোকে, দুঃখে, দুর্দ্দিনে সে প্রাণ-ঢালা সেবা করলো। কিন্তু যেদিন বুঝল বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না—দূরেও ঠেলে দেয়, সেইদিনই সে তার প্রাণাধিক প্রিয়তমকে নিঃশব্দে দূরে সরিয়ে দিলে।

অভয়া। তারপরে কি হ'লো জানেন?

শ্রীকান্ত। জানি। তারপরে আর নেই।

অভয়া। আপনি কি এই বলতে চান যে, আমি একা নই, এমনি দুর্ভাগ্য মেয়েমানুষের অদৃষ্টে চিরদিন ঘটে আসছে। আর সে দুঃখ সহ্য করাই তাদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব?

শ্রীকান্ত। আমি কিছুই বলতে চাইনে। শুধু এইটুকু তোমাকে জানাতে চাই যে, মেয়েমানুষ, পুরুষমানুষ নয়। তাদের আচার-ব্যবহার এক তুলাদণ্ডে ওজন করাও যায় না, আর গেলেও তাতে সুবিধা হয় না।

অভয়া। কেন হয় না বলতে পারেন?

শ্রীকান্ত। না। তাও পারিনে। তবে আমার জীবনে আমি যে ক'টি নারী-চরিত্র দেখতে পেয়েছি, সবাই তারা দুঃখের ভেতর দিয়ে আমার মনের মধ্যে বড় হয়ে আছে। আমার অন্নদাদিদি সারাজীবন সমস্ত দুঃখের ভার নিঃশব্দে বহন করেছেন। আর রাজলক্ষ্মী তার ত্যাগের দুঃখ যে কত বড়—সে তো আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি। এই দুঃখের জোরে সে আমার সমস্ত বুক জুড়ে আছে! (হাতের আংটিটি লইয়া নাড়া চাড়া করিতে লাগিল)

অভয়া। তবে আপনি কি তাঁর—

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ। তা না হলে সে এত সহজে আমাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারত না। হারাবার ভয়ে প্রাণপণে কাছে টেনে রাখতে চাইত।

অভয়া। তার মানে রাজলক্ষ্মী জানে, আপনাকে তার হারাবার ভয় নেই?

শ্রীকান্ত। শুধু ভয় নয়, রাজলক্ষ্মী জানে, আমাকে তার হারাবার যো নেই। এ-জীবনে আমি নিজেও বড় কম দুঃখ পাইনি অভয়া! তার থেকে আমি এই বুঝেছি যে, দুঃখ জিনিসটা অভাবও নয়—শূন্যও নয়। ভয় ছাড়া যে দুঃখ, তাকে সুখের মতই উপভোগ করা যায়।

অভয়া। আপনার কথা বুঝেছি শ্রীকান্তবাবু। অন্নদাদিদি রাজলক্ষ্মী এরা দুঃখটাকে জীবনে সম্বল করেছেন। কিন্তু আমার তাও হাতে নেই। রাজলক্ষ্মী অন্নদাদিদি এঁদের জীবনের সঙ্গে আমার কোথাও মিল নেই শ্রীকান্তবাবু! আমার জীবনটা একবার আগাগোড়া ভেবে দেখুন দেখি, আমাকে যিনি বিয়ে করেছিলেন, তাঁর কাছে না এসেও আমার উপায় ছিল না, আর এসেও উপায় হ'লো না, নিষ্ফলতার এই দুঃখটাই সারাজীবন বয়ে বেড়ানই কি আমার নারী-জন্মের সবচেয়ে বড় সাধনা হবে? না শ্রীকান্তবাবু, রোহিণাদার সমস্ত জীবনটাকে পঙ্গু ক'রে দিয়ে আমি সতী নাম কিনতে চাই না। একটা রাত্রের বিবাহ-অনুষ্ঠান যা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কাছে মিথ্যা হয়ে গেছে, তাকে জোর ক'রে সত্য বলে সারাজীবন খাড়া ক'রে রাখার জন্যে, এই এতবড় ভালবাসাকে একবারে ব্যর্থ করে দিতে আমি পারব না।

শ্রীকান্ত। স্বামীকে পেলে না বলেই কি রোহিণীদার ভালোবাসাটাকে আজ বড় করে দেখছো?

অভয়া। ঠিক তাই। মানুষ যখন ডুবে মরে, তখন বাঁচার আশায় তৃণ-খণ্ডকেও আঁকড়ে ধরতে চায়।

শ্রীকান্ত। তা হয়ত চায়, কিন্তু তোমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সমাজে কি স্থান হবে, তা ভেবে দেখেছ কি?

অভয়া। দেখেছি, আমাদের নিষ্পাপ ভালোবাসার সন্তানরা মানুষ হিসেবে জগতে কারো চেয়ে ছোট হবে না। তাদের দিয়ে যাওয়ার মত জিনিস তাদের বাপমায়ের হয়তো কিছু থাকবে না, কিন্তু তাদের মা

তাদের এই বিশ্বাস দিয়ে যাবে যে তারা সত্যের মধ্যে জন্মেছে। সত্যের চেয়ে বড় সম্বল আর তাদের কিছুই নেই।

শ্রীকান্ত। অন্তর্যামীর কাছে তোমরা হয়তো নিষ্পাপ ; তিনি তোমাদের কল্যাণ করবেন। কিন্তু মানুষ ত মানুষের অন্তর দেখতে পায় না। তাদের ত প্রত্যেকের হৃদয় অনুভব ক'রে বিচার করা সম্ভব নয়। প্রত্যেকের জন্যে আলাদা নিয়ম গড়তে গেলে, সমাজের কাজ-কর্ম্ম শৃঙ্খলা সমস্তই ভেঙে যায়।

অভয়া। যে সমাজে যে ধর্ম্মের মধ্যে আমাদের তুলে নেওয়ার মত উদারতা আছে, স্থান আছে, আপনি কি তবে আমাকে সেই সমাজেই আশ্রয় নিতে বলেন, আপনার লোক হ'য়ে আপনার জনকে আপনারা সঙ্কটের কালে আশ্রয় দিতে পারবে না, সে আশ্রয় ভিক্ষে করে নিতে হবে পরের কাছে! তাতে কি গৌরব বাড়বে শ্রীকান্তবাবু?

শ্রীকান্ত। গৌরব বাড়বে কি কমবে তা আমি জানিনে বোন! তবে তোমার জীবনের নতুন সমস্যার কথা রাজলক্ষ্মীকে জানাবার লোভ আমি সংবরণ করতে পারছি না। কেননা, তোমার জীবনের প্রশ্ন বড় অদ্ভুত।

অভয়া। অদ্ভুত কি-না জানি না—তবে আমিও বলে রাখছি শ্রীকান্তবাবু। সমস্ত অপযশ সমস্ত কলঙ্ক সমস্ত দুর্ভাগ্য আমি মাথায় নিয়ে চিরদিন আপনাদের হ'য়েই থাকব। আমার একটি সন্তানকে যদি কোনদিন মানুষের মত মানুষ করে তুলতে পারি সেদিন আমার সকল দুঃখ সার্থক হবে। সত্যিকারের মানুষই মানুষের মধ্যে বড়, না, তার জন্মের হিসেবটাই জগতের বড় এ আমাকে যাচাই ক'রে দেখতেই হবে।

শ্রীকান্ত। যাবার সময় সর্ব্বান্তঃকরণে তোমায় এই আশীর্ব্বাদ করছি জীবন-সংগ্রামে যাচাই করা তোমার যেন সার্থক হয়।

(শ্রীকান্ত ধীরে ধীরে চলিয়া যায়। অভয়া অপলক-দৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া থাকে।)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজলক্ষ্মীর কাশীর বাড়ী

গরীব-দুঃখীদের বিলি করার জন্য বঙ্কু কাপড়, কম্বল, টাকা-পয়সা ইত্যাদি গোছ করিতেছিল, রতন বঙ্কুর পাশে দাঁড়াইয়া ছিল।

রতন। তাহ'লে কাপড়, কম্বল, টাকা-পয়সা গরীব-দুঃখীদের কি আজই বিলোনো হবে দাদাবাবু?

বঙ্কু। (চিঠি পড়িতে পড়িতে) হ্যাঁ, গোছগাছ ত একরকম হোল, তা মা কোথায়?

*রতন। দীক্ষা নিয়ে একবার বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে গেছেন—

রাজলক্ষ্মী। (নেপথ্য হইতে) রতন! ও রতন! টাঙ্গাওয়ালাকে ভাড়াটা মিটিয়ে দে—

রতন। এই যে যাই মা। (ব্যস্তভাবে প্রস্থান, সঙ্গে সঙ্গে রাজলক্ষ্মীর প্রবেশ)

রাজলক্ষ্মী। হ্যাঁরে বঙ্কু! ব্রাহ্মণ-ভোজনের তাহ'লে কি হবে বাবা?

বঙ্কু। আমার মনে হয় ও হাঙ্গামার মধ্যে আর না যাওয়াই ভালো মা!

রাজলক্ষ্মী। তোর বিয়ে দিয়ে ছেলের বৌ ঘরে আনার আগে আমি দীক্ষা নিলাম, লোকে কথায় বলে দীক্ষা নেওয়া মানে নবজন্ম লাভ করা। তাই ভাবছিলাম ব্রাহ্মণ-ভোজন করাই আর না করাই, অন্ততঃ দ্বাদশ ব্রাহ্মণের বাড়ীতে কিছু সিধে পাঠিয়ে দিই।

বঙ্কু। না মা, ও-সবের আর দরকার নেই—দরিদ্র নারায়ণ! সেই দরিদ্র-নারায়ণ সেবার চেয়ে আর বড় কি আছে?

(সহসা নেপথ্যে রতন—'মা-মা, বাবু এসেচেন' শ্রীকান্ত ও রতনের প্রবেশ)

বঙ্কু। (শ্রীকান্তকে দেখিয়া) এই যে। আসুন আসুন। আপনি যে চার-পাঁচদিন হোল রেঙ্গুন থেকে বেরিয়েছেন, গতকাল রোহিণীবাবুর চিঠিতে তা জানতে পেরেছি।

রাজলক্ষ্মী। ওরে রতন! জিনিসপত্রগুলো গাড়ী থেকে নামিয়ে নিয়ে আয়।

রতন। বাবু জিনিসপত্র তো কিছুই সঙ্গে আনেননি মা।

বঙ্কু। সে কি!

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ। একটা বিশেষ জরুরী কাজে আজই আমাকে কোলকাতায় ফিরে যেতে হবে বঙ্কু।

রাজলক্ষ্মী। ওরে বঙ্কু! বাবা, তুই এক কাজ কর্। রতনকে সঙ্গে নিয়ে গুরুদেবের জিনিসগুলো টাঙ্গা কোরে এইবেলা পৌছে দিয়ে আয়। আর ঐ-সঙ্গে ষ্টেশনে গিয়ে গাড়ী রিজার্ভ করে আসবি, কালই আমাদের পাটনায় যেতে হবে।

বঙ্কু। আচ্ছা মা। এস রতন। (রতন-সহ বঙ্কুর প্রস্থান)

শ্রীকান্ত। তোমাকে যে এভাবে, এবেশে দেখবো, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

রাজলক্ষ্মী। কেন? বেশটা কি খারাপ?

শ্রীকান্ত। না, না, খারাপ হবে কেন? তপশ্চারিণীর বেশ! কিন্তু তোমার ব্যাপার কি বলতো? কাশীতে বাড়ী কিনলে, গুরুদেবের কাছে দীক্ষা নিলে, বঙ্কুকে সংসারী করারও ব্যবস্থা করেচো। এর পর তুমি কি আশ্রমবাসিনী হবে?

রাজলক্ষ্মী। সেই পরামর্শ করার জন্যেই তো তোমায় রেঙ্গুন থেকে টেনে আনালুম।

শ্রীকান্ত। ও! আমার কাছে কিন্তু এ বিষয়ে কোন পরমর্শই পাবে না। রেঙ্গুনের অভয়া সেও এক চরম মুহূর্ত্তে আমার পরামর্শ চেয়েছিল। তাকেও আমি কোন পরমর্শ দিতে পারিনি। কেননা, তোমার মত তারও জীবনের প্রশ্ন বড় অদ্ভুত।

রাজলক্ষ্মী। অদ্ভুত কিনা জানি না। তবে তোমার চিঠিতে অভয়ার সব কথা জেনে, আমি সেই তেজস্বিনী নারীর উদ্দেশ্যে সহস্রকোটী প্রণাম জানিয়েছি। ভেবে দেখেছি, জীবনটা কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা নয়। সারাজীবন প্রশ্নের পর প্রশ্ন, জীবনটাকে শুধু তোলপাড় করে তুলল। কিন্তু প্রশ্নের কোন জবাব মিলল না।

শ্রীকান্ত। কি করে মিলবে লক্ষ্মী? জীবন-ভোর তো শুধু প্রশ্নই করে যাচ্ছ—জবাব তো চাওনি কোনদিন।

রাজলক্ষ্মী। চেয়েছি। পাইনি।

শ্রীকান্ত। কি চেয়েছ? তুমি তো জীবন-ভোর দুঃখটাকেই ভোগ করতে চেয়েছ।

রাজলক্ষ্মী। কিন্তু উপায় ক? মেয়েমানুষকে তো এ দুঃখভোগ করতেই হয়, নইলে তো সংসার চলতে পারে না।

শ্রীকান্ত। মেয়েমানুষের এ সেই সনাতন দাসত্বের সংস্কার।

রাজলক্ষ্মী। তা হতে পারে। কিন্তু দোহাই তোমাদের তাদের দুঃখে তোমরা আর আকুল হয়ে কেঁদে বেড়িও না। বরঞ্চ, দাসীর মত তাদের থাকতে দাও। আজ ত আমার টাকার অভাব নেই, কিন্তু আমার মত দুঃখী কেউ আছে কি? পথের ভিক্ষুক যে, সেও বোধ হয় আমার চেয়ে আজ ঢের বেশী সুখী।

শ্রীকান্ত। (রাজলক্ষ্মীর হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া) তোমার কি সত্যই এত কষ্ট?

রাজলক্ষ্মী। (চোখ মুছিয়া) আমার কথা আমার অন্তর্যামী জানেন।

শ্রীকান্ত। কি করলে তোমার বাকী জীবনটা সুখে কাটে, আমাকে বলতে পার?

রাজলক্ষ্মী। আমার সমস্ত টাকাকড়ি যদি কোনরকমে চলে যায়, কিছু যদি না থাকে, একেবারে নিরাশ্রয় হই, তাহলে—

শ্রীকান্ত। এ-কথা তোমার কবে থেকে মনে হয়েছে লক্ষ্মী?

রাজলক্ষ্মী। যেদিন তোমার চিঠিতে অভয়ার কথা জানতে পারি, সেইদিন থেকে।

শ্রীকান্ত। কিন্তু তাদের জীবনযাত্রা তো এরই মধ্যে শেষ হয়ে যায়নি। ভবিষ্যতে হয়তো তারা বহু দুঃখ পেতে পারে।

রাজলক্ষ্মী। তা হয়তো পারে। কিন্তু আমার মত দুঃখ তারা কোন দিনই পাবে না—এ আমি নিশ্চয় কোরে বলতে পারি।

শ্রীকান্ত। সারাজীবন শুধু অভিমানই বুকে কোরে বয়ে নিয়ে বেড়ালে লক্ষ্মী! কিন্তু মুখ ফুটে মনের কথা কোনদিন প্রকাশ কোরলে না!

রাজলক্ষ্মী। অভিমান তোমারই বা কম কি? পাটনার বাড়ী থেকে একদিন তুমিও তো এমনি অভিমানে রেঙ্গুনের পথে পাড়ি দিয়েছিলে!

শ্রীকান্ত। দিয়েছিলাম সত্যি। কিন্তু তোমার প্রেমের মহান্ ঐশ্বর্য্যের কাছে সে অভিমান, আমার ধুয়ে মুছে গিয়েছিল। জীবনটা জিজ্ঞাসা নয়, জানি। কিন্তু সব ত্যাগ কোরলেও সম্ভ্রম তো ত্যাগ করা যায় না লক্ষ্মী!

রাজলক্ষ্মী। তোমাকে তো আমি কিছুই ত্যাগ কোরতে বলিনি—

শ্রীকান্ত। না, তাও বলোনি বটে। কিন্তু আমি ভাবছি কি জান? লোকে তো মনসা পণ্ডিতের পাঠশালার সেই রাজলক্ষ্মীকে চিনবে না, তারা চিনবে পাটনার প্রসিদ্ধা পিয়ারী বাইজীকে!

রাজলক্ষ্মী। হ্যাঁ তাতো বটেই!—আমারই আগাগোড়া ভুল, এখন বুঝতে পারছি, শুধু এই কটি কথা জানিয়ে কোলকাতায় ফিরে যাবে বলে, এক জামাকাপড়ে চলে এসেছ।

শ্রীকান্ত। তুমি আমায় ভুল বুঝো না লক্ষ্মী! একটা বিশেষ জরুরী কাজে আজই আমাকে কোলকাতায় ফিরে যেতে হবে। পাছে তুমি ভাব বা কষ্ট পাও, তাই কোলকাতায় জাহাজ থেকে নেমেই সোজা তোমার কাছে চলে এসেছি। দেশের বাড়ীতে একবার যেতে হবে। সেখান থেকে রেঙ্গুনে যাওয়ার আগে তোমার সঙ্গে দেখা কোরে যাবো। আজ দীক্ষা নিয়ে যে নবজন্ম তুমি লাভ কোরলে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তা সার্থক হয়।

(রাজলক্ষ্মী সাশ্রুনয়নে গলবস্ত্রে শ্রীকান্তকে প্রণাম করিল। অব্যক্ত বেদনায় তখন কেবল তাহার ঠোঁট দুটি নড়িতেছিল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

পাটনা। পিয়ারী বাইজীর বাড়ী

রতন। বলি, একা একা চোখ ঠিকরে সারাদিন কি ছাই পড়ছ? বিয়ে-থা হ'ল, কোথায় স্ফূর্তি করে ঘুরে ফিরে বেড়াবে, তা নয়, সারাদিন শুধু ঘরের কোণে বই মুখে নিয়ে বসে আছ। তোমার ব্যাপার কি বলতো?

বঙ্কু। ব্যাপার আর কি? ব্যাপার কিছুই নয়।

রতন। তুমি নয় বললেই আমি শুনছি কি না? নিশ্চয়ই তোমার একটা কিছু হয়েছে। মুখে হাসি নেই, কথা নেই—

বঙ্কু। ছেলের বিয়ে দিয়ে, ছেলের মায়ের মুখের হাসি যদি মিলিয়ে যায়, তাহলে ছেলের মুখে হাসি কি করে থাকে রতন? মার জন্যে বড়ই ভাবনার কথা হোল। তুমি জান না রতন, মা যে এদিকে সর্ব্বস্ব দান করার জন্যে উইল করেছেন।

রতন। এ্যাঁ! বল কি দাদাবাবু! উইল করেছেন?

বঙ্কু। হ্যাঁ, সে উইলে অবশ্য কাউকে তিনি বঞ্চিত করেননি। উইলের একটা মোটা অংশ আমিও পেয়েছি। কিন্তু পাওয়াটাই তো সব নয় রতন। সময়ের দান আর অসময়ের দানের ভেতর অনেক পার্থক্য আছে যে। এ যেন বহুদুঃখের সঞ্চিত অর্থ, মাকে আমার বহু দুঃখেই বিলিয়ে দিতে হচ্ছে!

রতন। না না। কিছুতেই এ উইল মাকে করতে দেওয়া হবে না। যেমন করেই হোক বাধা দিতেই হবে। এই নাও আজ ডাকে একটা চিঠি এসেছে।

(রতন চিঠি দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, বঙ্কু চিঠি পড়িয়া ডাকিল)

বঙ্কু। রতন—

রতন। (ফিরিয়া) কি দাদাবাবু?

বঙ্কু। (চিঠি পড়িয়া) শ্রীকান্তবাবু দেশের বাড়ীতে গিয়ে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ভাখ তো মার পূজো হ'লো কি না? চিঠিটা খুব জরুরী—

(ইতিমধ্যে পূজা সারিয়া শুদ্ধাচারিণীর বেশে রাজলক্ষ্মী ঘরে প্রবেশ করিল)

রাজলক্ষ্মী। কার আবার জরুরী চিঠি এল বঙ্কু?

বঙ্কু। শ্রীকান্তবাবু তোমাকে একটা চিঠি লিখেছেন মা। দেশের বাড়ীতে গিয়ে তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

(হাত বাড়াইয়া বঙ্কুর নিকট হইতে চিঠি লইয়া পড়িতে লাগিল)

বঙ্কু। অর্ডিনারি মনি অর্ডার কোরলে টাকাটা গিয়ে পৌঁছতে দেরী হতে পারে মা। তার চেয়ে T.M.O. করলে হয় না?

রাজলক্ষ্মী। না, না, T.M.O. নয়। শুধু টাকায় রোগ যায় না বঙ্কু, সেই সঙ্গে সেবারও প্রয়োজন হয়। বঙ্কু! আর দাঁড়িয়ে থাকিসনে বাবা! এখুনিই আমার দেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দে—

বঙ্কু। আচ্ছা মা। (প্রস্থান)

রতন। কিন্তু এখনও যে আপনার খাওয়া হয়নি মা! যাহোক কিছু মুখে না দিয়ে গেলে যে—

রাজলক্ষ্মী। না না—রতন, তিনি যে রোগ আর অর্থের কষ্টে কাতর হয়ে আছেন—আমি কি আর এখন খাওয়ার জন্যে দেরী করতে পারি বাবা!

(সঙ্গে সঙ্গে রতনও তাহার অনুসরণ করিল)

তৃতীয় দৃশ্য

শ্রীকান্তর দেশের বাড়ীর একটি কক্ষ

শ্রীকান্ত খাটের উপর শয্যায় শুইয়া আছে। মাথার শিয়রে একটি টুলের উপর জলের গ্লাস, ঔষধের শিশি প্রভৃতি দেখা যাইতেছে। বিছানার উপরে একটি হাত-পাখা। একদিনে শ্রীকান্তর চেহারার বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। গোবিন্দ ডাক্তার শ্রীকান্তকে পরীক্ষা করিতেছিলেন। কান হইতে ষ্টেথিস্‌স্কোপ খুলিয়া বলিলেন—

গোবিন্দ ডাঃ। তাইতো বাবাজী! বড়ই ভাবিয়ে তুললে! নম্বরটা তো নাড়ী থেকে একেবারে যাচ্ছে না—

শ্রীকান্ত। আপনার কি মনে হচ্ছে এখনও খুব জ্বর রয়েছে?

গোবিন্দ ডাঃ। না, জ্বর বেশী নেই, তবে একেবারে বি-জ্বরটা তো হচ্ছে না। সব সময়ে একটু না একটু নাড়ীতে লেগেই রয়েছে। এখন দেখছি, তোমার প্রসন্ন ঠাকুরদা অর্থাৎ তোমার বাবার মাতুল মহাশয় ঠিকই বলেছিলেন। তখন তোমার পিসিমাকে একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল। সারাদিন এই জ্বর ভোগ কোরছ—তার ওপর একা একা থাকা—

শ্রীকান্ত। আমি ভবঘুরে মানুষ। একা থাকা আমার অভ্যেস আছে। ওর জন্যে আমার কোন কষ্ট নেই—

গোবিন্দ ডাঃ। তা এদিকে তোমার হ'লো গিয়ে বাবাজী! সাত শিশি ওষুধ, চোদ্দটা পুরিয়া, আর তাছাড়া সাতদিনের ভিজিট—

শ্রীকান্ত। ওর জন্যে আপনি ভাববেন না ডাক্তার বাবু! চিঠি আমি দিয়েছি। আজকালের মধ্যে টাকা হয়তো এসে যাবে।

গোবিন্দ ডাঃ। না না, ও-জন্যে আমি কিছু বলিনি। হিসেবটা ঠিক রাখার জন্যে কথাটা তোমাকে একটু জানিয়ে রাখলাম। তোমার কাছে আবার টাকার ভাবনা! ভাল হও, তারপর যখন সুবিধে হয় তখন পাঠিয়ে দিও। আচ্ছা বাবাজী! তাহ'লে এখন আমি আসি।

(ব্যাগ ও ষ্টেথিস্কোপ লইয়া দুই এক পা অগ্রসর হইতেই রতনকে দরজার কাছে দেখা গেল—গোবিন্দ ডাক্তার তাহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া ঘরের বাহির হইতে যাইবেন এমন সময় রতন বলিল)

রতন। মা, এইদিকে, বাবু এই ঘরে—

(রাজলক্ষ্মী মাথায় ঘোমটা টানিয়া ঘরে প্রবেশ করিল, গোবিন্দ ডাক্তার তাহা লক্ষ্য করিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলেন। সঙ্গে

সঙ্গে রতনও বাহির হইয়া গেল। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া পরে শ্রীকান্তর কপালের ও বুকের উত্তাপ অনুভব করিয়া বলিল)

রাজলক্ষ্মী। এখন আর জ্বর নেই ?

শ্রীকান্ত। ডাক্তারবাবু তো বললেন, আছে সামান্য।

রাজলক্ষ্মী। ও-বেলায় সাতটার গাড়ীতে যাওয়া চলবে কি ?

শ্রীকান্ত। তুমি কি আমাকে আজই নিয়ে যেতে চাও ?

রাজলক্ষ্মী। থাক্, রাত্রে ঠাণ্ডায় আজ আর গিয়ে কাজ নেই। কাল সকালেই না হয় যাব।

শ্রীকান্ত। তা তো যাবো কিন্তু এ গ্রামে, এ-পাড়ার মধ্যে তুমি ঢুক্লে কোন্ সাহসে ? তুমি কি মনে করো, তোমাকে কেউ চিন্‌তে পারবে না ?

রাজলক্ষ্মী। বেশ যা হোক, এখানে মানুষ হলাম, আর এখানে আমাকে চিমতে পারবে না। যে দেখবে, সেই তো চিনবে।

শ্রীকান্ত। তবে ?

রাজলক্ষ্মী। কি ক'রবো বলো ? আমার কপাল! নইলে তুমি এখানে এসেই বা অসুখে পড়বে কেন ?

শ্রীকান্ত। কিন্তু এলে কেন ? টাকা চেয়েছিলাম, টাকা পাঠিয়ে দিলেই তো হ'তো।

রাজলক্ষ্মী। তাকি কখনও হয় ? এত অসুখ শুনে কি শুধু টাকা পাঠিয়ে স্থির হ'য়ে থাকতে পারি ?

শ্রীকান্ত। আঃ! তুমি না হয় স্থির হ'লে—কিন্তু আমাকে যে ভয়ানক অস্থির ক'রে তুললে! এখনই সবাই হয়তো এসে পড়বে তখন তুমিই বা মুখ দেখাবে কি ক'রে, আর আমিই বা জবাব দেবো কি ?

(রাজলক্ষ্মী কপালে হাত দিয়া বলিল)

রাজলক্ষ্মী। জবাব আর কি দেবে—আমার অদৃষ্ট!

শ্রীকান্ত। অদৃষ্টই বটে! কিন্তু লজ্জা-সরমের মাথা কি একেবারে খেয়ে বসে আছ? এখানে মুখ দেখাতে তোমায় বাধল না?

রাজলক্ষ্মী। আমার লজ্জা-সরম যা-কিছু এখন সব তুমি—

শ্রীকান্ত। (কিছুক্ষণ পরে) বঙ্কুর বিয়ে নির্ব্বিঘ্নে হ'য়ে গেছে?

রাজলক্ষ্মী। হ্যাঁ।

শ্রীকান্ত। একে অসুখে পড়ে। তার ওপর আবার টাকা কটা চুরি হয়ে গেল! মহা অসুবিধায় পড়লাম। তাই অনেক ভেবে-চিন্তে পাটনা আর কোলকাতায় দু'জায়গার ঠিকানায় দু'খানা চিঠি দিলাম এই আশায় যে, যেখানেই তুমি থাক না কেন, আমার চিঠিটা গিয়ে তোমার হাতে পৌছবে। তা যাক্। এখন আসছ কোথা থেকে?

রাজলক্ষ্মী। পাটনায় তোমার চিঠি পেলাম। সেখান থেকেই আসছি।

শ্রীকান্ত। আমাকে নিয়ে যাবে কোথায়? পাটনায়?

রাজলক্ষ্মী। সেখানে তো তোমায় একবার যেতেই হবে। তার আগে কোলকাতায় নিয়ে গিয়ে সেখানে দেখিয়ে শুনিয়ে ভাল ক'রে, তারপর—

শ্রীকান্ত। কিন্তু তারপরেই বা আমাকে পাটনায় যেতে হবে কেন শুনি?

রাজলক্ষ্মী। দানপত্র তো সেইখানেই রেজেষ্ট্রী করতে হবে। লেখা-পড়া সব একরকম করেই রেখে এসেছি বটে, কিন্তু তোমার হুকুম ছাড়া তো হ'তে পারবে না।

শ্রীকান্ত। (সবিস্ময়ে) কিসের দানপত্র? কাকে কি দিলে?

রাজলক্ষ্মী। বাড়ী দুটো বঙ্কুকে দিয়েছি। শুধু কাশীর বাড়ীটা গুরুদেবকে দেবো ভেবেছি। আর কোম্পানীর কাগজ গয়না-টয়না-

গুলো আমার বুদ্ধি-বিবেচনা-মত একরকম ভাগ ক'রে এসেছি। এখন শুধু তুমি বললেই—

শ্রীকান্ত। তাহ'লে তোমার নিজের রইল কি? বঙ্কু যদি তোমার ভার না নেয়? এখন তার নিজের সংসার হ'লো। শেষে যদি সে তোমাকে খেতে পরতে না দেয়?

রাজলক্ষ্মী। আমি কি তাই চাইছি নাকি? নিজের সমস্ত দান করে কি শেষে তারই হাততোলা খেয়ে থাক্‌বো? তুমি তো বেশ!

(শ্রীকান্ত উত্তেজনায় উঠিয়া বসিয়া বলিল)

শ্রীকান্ত। হরিশ্চন্দ্রের মত এ দুর্বুদ্ধি তোমায় কে দিলে? খাবে কি? এই বয়সে কার গলগ্রহ হ'য়ে থাকবে?

রাজলক্ষ্মী। তোমাকে রাগ করতে হবে না। তুমি শোও। আমাকে যে বুদ্ধি দিয়েছে, সেই আমাকে খেতে দেবে। সে কখনও আমাকে গলগ্রহ ভাববে না। তুমি মিথ্যে মাথা গরম কোরো না, স্থির হয়ে শোও।

(রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে শোয়াইয়া দিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। সহসা গোবিন্দ ডাক্তারের সহিত প্রসন্ন ঠাকুরদা ঘরে প্রবেশ করলেন। রাজলক্ষ্মী শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া যাইবার অবকাশ পাইলেন না। লজ্জায় মুখ নত করিয়া বসিয়া রহিল। গোবিন্দ ডাক্তার ইঙ্গিতে প্রসন্ন ঠাকুরদার দৃষ্টি আকর্ষণ করাইলেন। প্রসন্ন ঠাকুরদা নির্লজ্জের মত রাজলক্ষ্মীকে দেখিতে লাগিলেন। রাজলক্ষ্মী লজ্জায় জড়সড় হইয়া গেল।)

প্রসন্ন ঠাকুরদা। মেয়েটি কে শ্রীকান্ত? যেন চিনি চিনি মনে হচ্ছে—

গোবিন্দ ডাঃ। আমারও মনে হ'চ্ছে ছোট খুড়ো, এঁকে যেন কোথায় দেখেছি—

শ্রীকান্ত। দেখেছেন বৈকি! লজ্জা কি রাজলক্ষ্মী, তুমি স্বামীর সেবা করতে এসেছ, ঠাকুরদা ডাক্তারবাবু এঁদের প্রণাম কর।

(রাজলক্ষ্মী উঠিয়া প্রণাম করিতে যাইতেছিল প্রসন্ন ঠাকুরদা বাধা দিয়া বলিলেন)

প্রসন্নঠাকুরদা। থাক্ থাক্। পেন্নামে আর কাজ নেই! তাহ'লে ডাক্তার! তুমি তো বড় মিথ্যে বলনি। হা-হা-হা। তা বেশ—তা বেশ!

(প্রসন্ন ঠাকুরদা ও গোবিন্দ ডাক্তার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। রাজলক্ষ্মীর দুই চোখে তখন অশ্রুর বন্যা নামিয়াছে। সে আকুলভাবে শ্রীকান্তর বুকে মাথা রাখিয়া কহিল)

রাজলক্ষ্মী। ওগো! তোমার কথা তুমি ফিরিয়ে নাও—ফিরিয়ে নাও। তুমি একি করলে! একি করলে!

শ্রীকান্ত। (রাজলক্ষ্মীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে) এই চরম মুহূর্ত্তে এছাড়া আর আমার উপায় ছিল না লক্ষ্মী। কে যেন আমার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে বলে উঠলো—শ্রীকান্ত, এই সর্ব্বত্যাগী মেয়েটি শুধু তোমারই জন্যে এই দুঃখ স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নিয়েছে! তাকে তুমি গ্রহণ কর—গ্রহণ কর।

—যবনিকা—

পরিশিষ্ট

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত

প্রথম অভিনয় ঃ ৭ই জানুয়ারী '৫৭

সংগঠন ঃ

প্রযোজনা ঃ শ্রীসলিলকুমার মিত্র
নাট্যরূপ ঃ শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত
পরিচালনা ঃ শ্রীশিশির মল্লিক
গীতিকার ঃ শ্রীশৈলেন রায়
শ্রীসুরেশ চৌধুরী
মঞ্চ-শিল্পী ঃ শ্রীমণীন্দ্র দাস (নানুবাবু)
সুরকার ঃ শ্রীদুর্গা সেন
নৃত্য-পরিকল্পনা ঃ শ্রীসমর ঘোষ
মঞ্চাধ্যক্ষ ঃ শ্রীঅনিল বসু

স্মারক

কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্য সরকার

যন্ত্রীসঙ্ঘ

শিশির চক্রবর্ত্তী, কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ কুণ্ডু, মুরারী রায়, মাখন মুখোপাধ্যায়, শচীন বোস, অনিলবরণ রায়

আলোক-সম্পাতকারী

মণীন্দ্রনাথ দে, বৈদ্যনাথ সেন, ভানু মুখার্জ্জি, জলধর নান, মণীন্দ্রনাথ ঘোষ, বেজপৎ সিং, কানাইলাল ধর

রূপসজ্জাকর

নৃপেন রায়, সেখ ফরহাদ, কালী দাস, কৃষ্ণ দাস, বটকৃষ্ণ দে

মঞ্চ-মায়াকর

শশীভূষণ দাস, অনিলকুমার দাস, ভূষণ সামন্ত, ভগীরথ মিস্ত্রী, বিজয় চিত্রকর, যুগল গুঁই, মণীন্দ্রনাথ দাস, রামদাস দাস, সন্তোষ সরকার, সুকুমার দে, বলাই অধিকারী, কার্ত্তিক কর্ম্মকার